তিন সঙ্গী

তিন সঙ্গী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

রবিবার

আমার গল্পের প্রধান মানুষটি প্রাচীন ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বংশের ছেলে। বিষয়ব্যাপারে বাপ ওকালতি ব্যবসায়ে আঁঠি পর্যন্ত পাকা, ধর্মকর্মে শাক্ত আচারের তীব্র জারক রসে জারিত। এখন আদালতে আর প্র্যাকটিস করতে হয় না। এক দিকে পূজা-অর্চনা আরেক দিকে ঘরে বসে আইনের পরামর্শ দেওয়া, এই দুটোকে পাশাপাশি রেখে তিনি ইহকাল-পরকালের জোড় মিলিয়ে অতি সাবধানে চলেছেন। কোনোদিকেই একটু পা ফসকায় না।

এইরকম নিরেট আচারবাঁধা সনাতনী ঘরের ফাটল ফুঁড়ে যদি দৈবাৎ কাঁটাওয়ালা নাস্তিক ওঠে গজিয়ে, তা হলে তার ভিত-দেয়াল-ভাঙা মন সাংঘাতিক ঠেলা মারতে থাকে ইঁটকাঠের প্রাচীন গাঁথুনির উপরে। এই আচারনিষ্ঠ বৈদিক ব্রাহ্মণের বংশে দুর্দান্ত কালাপাহাড়ের অভ্যুদয় হল আমাদের নায়কটিকে নিয়ে।

তার আসল নাম অভয়াচরণ। এই নামের মধ্যে কুলধর্মের যে ছাপ আছে সেটা দিল সে ঘষে উঠিয়ে। বদল করে করলে অভীককুমার। তা ছাড়া ও জানে যে প্রচলিত নমুনার মানুষ ও নয়। ওর নামটা ভিড়ের নামের সঙ্গে হাটে-বাজারে ঘেঁষাঘেঁষি করে ঘর্মাক্ত হবে সেটা ওর রুচিতে বাধে।

অভীকের চেহারাটা আশ্চর্য রকমের বিলিতি ছাঁদের। আঁট লম্বা দেহ গৌরবর্ণ, চোখ কটা, নাক তীক্ষ্ণ, চিবুকটা ঝুঁকেছে যেন কোনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে। আর ওর মুষ্টিযোগ ছিল অমোঘ, সহপাঠীরা যারা কদাচিৎ এর পাণিপীড়ন সহ্য করেছে তারা একে শতহস্ত দূরে বর্জনীয় বলে গণ্য করত।

ছেলের নাস্তিকতা নিয়ে বাপ অম্বিকাচরণ বিশেষ উদ্‌বিগ্ন ছিলেন না। মস্ত তাঁর নজির ছিল প্রসন্ন ন্যায়রত্ন, তাঁর আপন জেঠামশায়। বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন তর্কশাস্ত্রের গোলন্দাজ, চতুষ্পাঠীর মাঝখানে বসে

অনুস্বার-বিসর্গওয়ালা গোলা দাগেন ঈশ্বরের অস্তিত্ববাদের উপরে। হিন্দুসমাজ হেসে বলে 'গোলা খা ডালা', দাগ পড়ে না সমাজের পাকা প্রাচীরের উপরে। আচারধর্মের খাঁচাটাকে ঘরের দাওয়ায় তুলিয়ে রেখে ধর্মবিশ্বাসের পাখিটাকে শূন্য আকাশে উড়িয়ে দিলে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটে না। কিন্তু অভীক কথায় কথায় লোকাচারকে চালান দিত ভাঙা কুলোয় চড়িয়ে ছাইয়ের গাদার উদ্দেশে। ঘরের চার দিকে মোরগদম্পতিদের অপ্রতিহত সঞ্চরণ সর্বদাই মুখরধ্বনিতে প্রমাণ করত তাদের উপর বাড়ির বড়োবাবুর আভ্যন্তরিক আকর্ষণ। এ-সমস্ত ম্লেচ্ছাচারের কথা ক্ষণে ক্ষণে বাপের কানে পৌঁচেছে, সে তিনি কানে তুলতেন না। এমন-কি, বন্ধুভাবে যে-ব্যক্তি তাঁকে খবর দিতে আসত, সগর্জনে দেউড়ির অভিমুখে তার নির্গমনপথ দ্রুত নির্দেশ করা হত। অপরাধ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ না হলে সমাজ নিজের গরজে তাকে পাশ কাটিয়ে যায়, কিন্তু অবশেষে অভীক একবার এত বাড়াবাড়ি করে বসল যে তার অপরাধ অস্বীকার করা অসম্ভব হল। ভদ্রকালী ওদের গৃহদেবতা, তাঁর খ্যাতি ছিল জাগ্রত বলে। অভীকের সতীর্থ বেচারা ভজু ভারি ভয় করত ঐ দেবতার অপ্রসন্নতা। তাই অসহিষ্ণু হয়ে তার ভক্তিকে অশ্রদ্ধেয় প্রমাণ করবার জন্যে পুজোর ঘরে অভীক এমন-কিছু অনাচার করেছিল যাতে ওর বাপ আগুন হয়ে বলে উঠলেন, 'বেরো আমার ঘর থেকে, তোর মুখ দেখব না।' এত বড়ো ক্ষিপ্রবেগের কঠোরতা নিয়মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বংশের চরিত্রেই সম্ভব।

ছেলে মাকে গিয়ে বললে, "মা, দেবতাকে অনেককাল ছেড়েছি, এমন অবস্থায় আমাকে দেবতার ছাড়াটা নেহাত বাহুল্য। কিন্তু জানি, বেড়ার ফাঁকের মধ্য দিয়ে হাত বাড়ালে তোমার প্রসাদ মিলবেই। ঐখানে কোনো দেবতার দেবতাগিরি খাটে না, তা যত বড়ো জাগ্রত হোন-না তিনি।"

মা চোখের জল মুছতে মুছতে আঁচল থেকে খুলে ওকে একখানি

নোট দিতে গেলেন। ও বললে, "ঐ নোটখানায় যখন আমায় অত্যন্ত বেশি দরকার আর থাকবে না তখনই তোমার হাত থেকে নেব। অলক্ষ্মীর সঙ্গে কারবার করতে জোর লাগে, ব্যাঙ্কনোট হাতে নিয়ে তাল ঠোকা যায় না।"

অভীকের সম্বন্ধে আরো দুটো-একটা কথা বলতে হবে। জীবনে ওর দুটি উলটো জাতের শখ ছিল, এক কলকারখানা জোড়াতাড়া দেওয়া, আর-এক ছবি আঁকা। ওর বাপের ছিল তিনখানা মোটর-গাড়ি, তাঁর মফস্বল-অভিযানের বাহন। যন্ত্রবিদ্যায় ওর হাতেখড়ি সেইগুলো নিয়ে। তা ছাড়া তাঁর ক্লায়েন্টের ছিল মোটরের কারখানা, সেইখানে ও শখ করে বেগার খেটেছে অনেকদিন।

অভীক ছবি আঁকা শিখতে গিয়েছিল সরকারী আর্টস্কুলে। কিছু-কালের মধ্যেই ওর এই বিশ্বাস দৃঢ় হল যে, আর বেশিদিন শিখলে ওর হাত হবে কলে-তৈরি, ওর মগজ হবে ছাঁচে-ঢালা। ও আর্টিস্ট, সেই কথাটা প্রমাণ করতে লাগল নিজের জোর আওয়াজে। প্রদর্শনী বের করলে ছবির, কাগজের বিজ্ঞাপনে তার পরিচয় বেরল আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আর্টিস্ট অভীককুমার, বাঙালি টিশিয়ান। ও যতই গর্জন করে বললে 'আমি আর্টিস্ট' ততই তার প্রতিধ্বনি উঠতে থাকল একদল লোকের ফাঁকা মনের গুহায়, তারা অভিভূত হয়ে গেল। শিষ্য এবং তার চেয়ে বেশি সংখ্যক শিষ্যা জমল ওর পরিমণ্ডলীতে। তারা বিরুদ্ধদলকে আখ্যা দিল ফিলিস্টাইন। বলল বুর্জোয়া।

অবশেষে দুর্দিনের সময় অভীক আবিষ্কার করলে যে তার ধনী পিতার তহবিলের কেন্দ্র থেকে আর্টিস্টের নামের 'পরে যে রজতচ্ছটা বিচ্ছুরিত হত তারই দীপ্তিতে ছিল তার খ্যাতির অনেকখানি উজ্জ্বলতা। সঙ্গে সঙ্গে সে আর-একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিল যে অর্থভাগ্যের বঞ্চনা উপলক্ষ করে মেয়েদের নিষ্ঠায় কোনো ইতরবিশেষ ঘটে নি। উপাসিকারা শেষ পর্যন্ত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে উচ্চমধুর কণ্ঠে তাকে বলেছে আর্টিস্ট। কেবল নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে সন্দেহ

করেছে যে স্বয়ং তারা দুই-একজন ছাড়া বাকি সবাই আর্টের বোঝে না কিছুই, ভণ্ডামি করে, গা জ্বলে যায়।

অভীকের জীবনে এর পরবর্তী ইতিহাস সুদীর্ঘ এবং অস্পষ্ট। ময়লা টুপি আর তেলকালিমাখা নীলরঙের জামা-ইজের পরে বার্ন-কোম্পানির কারখানায় প্রথমে মিস্ত্রিগিরি ও পরে হেডমিস্ত্রির কাজ পর্যন্ত চালিয়ে দিয়েছে। মুসলমান খালাসীদের দলে মিশে চার পয়সার পরোটা আর তার চেয়ে কম দামের শাস্ত্রনিষিদ্ধ পশুমাংস খেয়ে ওর দিন কেটেছে সস্তায়। লোকে বলেছে, ও মুসলমান হয়েছে—ও বলেছে, মুসলমান কি নাস্তিকের চেয়েও বড়ো। হাতে যখন কিছু টাকা জমল তখন অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে এসে আবার সে পূর্ণ পরিস্ফুট আর্টিস্টরূপে বোহেমিয়ানি করতে লেগে গেল। শিষ্য জুটল, শিষ্যা জুটল। চশমাপরা তরুণীরা তার স্টুডিয়োতে আধুনিক বেআব্রু রীতিতে যে-সব নগ্নমনস্তত্ত্বের আলাপ-আলোচনা করতে লাগল, ঘন সিগারেটের ধোঁয়া জমল তার কালিমা আবৃত করে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি কটাক্ষপাত ও অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললে, পজিটিভ্‌লি ভাল্‌গর।

বিভা ছিল এই দলের একেবারে বাইরে। কলেজের প্রথম ধাপের কাছেই অভীকের সঙ্গে ওর আলাপ শুরু। অভীকের বয়স তখন আঠারো, চেহারায় নবযৌবনের তেজ ঝকঝক করছে, আর তার নেতৃত্ব বড়োবয়সের ছেলেরাও স্বভাবতই নিয়েছে স্বীকার করে।

ব্রাহ্মসমাজে মানুষ হয়ে পুরুষদের সঙ্গে মেশবার সংকোচ বিভার ছিল না। কিন্তু কলেজে বাধা ঘটল। তার প্রতি কোনো কোনো ছেলের অশিষ্টতা হাসিতে কটাক্ষে ইঙ্গিতে আভাসে স্ফুরিত হয়েছে। কিন্তু একদিন একটি শহুরে ছেলের অভদ্রতা বেশ একটু গায়ে-পড়া হয়ে প্রকাশ পেল। সেটা অভীকের চোখে পড়তেই সেই ছেলেটাকে বিভার কাছে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এসে বললে, 'মাপ চাও'। মাপ তাকে চাইতেই হল নতশিরে আমতা আমতা করে। তার পর

থেকে অভীক দায় নিল বিভার রক্ষাকর্তার। তা নিয়ে সে অনেক বক্রোক্তির লক্ষ্য হয়েছে, সমস্তই ঠিকরে পড়েছে তার চওড়া বুকের উপর থেকে। সে গ্রাহ্যই করে নি। বিভা লোকের কানাকানিতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ করেছে কিন্তু সেইসঙ্গে তার মনে একটা রোমাঞ্চকর আনন্দও দিয়েছিল।

বিভার চেহারায় রূপের চেয়ে লাবণ্য বড়ো। কেমন করে মন টানে ব্যাখ্যা করে বলা যায় না। অভীক ওকে একদিন বলেছিল, "অনাহূতের ভোজে মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ। কিন্তু তোমার সৌন্দর্য ইতরজনের মিষ্টান্ন নয়। ও কেবল আর্টিস্টের, লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চির ছবির সঙ্গেই মেলে, ইন্‌স্ক্রুটেব্‌ল্।"

একদা কলেজের পরীক্ষায় বিভা অভীককে ডিঙিয়ে গিয়েছিল, তা নিয়ে তার অজস্র কান্না আর বিষম রাগ। এ যেন তার নিজের অসম্মান। বললে, "তুমি দিনরাত কেবল ছবি এঁকে এঁকে পরীক্ষায় পিছিয়ে পড়ো, আমার লজ্জা করে।"

কথাটা দৈবাৎ পাশের বারান্দা থেকে কানে যেতেই বিভার এক সখী চোখ টিপে বলেছিল, "মরি মরি, তোমারই গরবে গরবিনী আমি, রূপসী তোমারই রূপে।"

অভীক বললে, "মুখস্থ বিদ্যার দিগ্‌গজেরা জানেই না আমি কোন্ মার্কাশূন্য পরীক্ষায় পাস করে চলেছি। আমার ছবি আঁকা নিয়ে তোমার চোখে জল পড়ে, আর তোমার শুকনো পণ্ডিতি দেখে আমার চোখের জল শুকিয়ে গেল। কিছুতেই বুঝবে না, কেননা তোমরা নামজাদা দলের পায়ের তলায় থাকো চোখ বুজে, আর আমরা থাকি বদনামি দলের শিরোমণি হয়ে।"

এই ছবির ব্যাপারে দুজনের মধ্যে তীব্র একটা দ্বন্দ্ব ছিল। বিভা অভীকের ছবি বুঝতেই পারত না সে কথা সত্যি। অন্য মেয়েরা যখন ওর আঁকা যা-কিছু নিয়ে হৈ-হৈ করত, সভা করে গলায় মালা পরাত সেটাকে বিভা অশিক্ষিতের ন্যাকামি মনে করে লজ্জা পেত। কিন্তু

তীব্র ক্ষোভে ছটফট করেছে অভীকের মন বিভার অভ্যর্থনা না পেয়ে। দেশের লোকে ওর ছবিকে পাগলামি বলে গণ্য করছে, বিভাও যে মনে মনে তাদেরই সঙ্গে যোগ দিতে পারলে এইটেই ওর কাছে অসহ্য। কেবলই এই কল্পনা ওর মনে জাগে যে, একদিন ও য়ুরোপে যাবে আর সেখানে যখন জয়ধ্বনি উঠবে তখন বিভাও বসবে জয়মাল্য গাঁথতে।

রবিবার সকালবেলা। ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা থেকে ফিরে এসেই বিভা দেখতে পেলে অভীক বসে আছে তার ঘরে। বইয়ের পার্সেলের ব্রাউন মোড়ক ছিল আবর্জনার ঝুড়িতে। সেইটে নিয়ে কালি কলমে একখানা আঁচড়-কাটা ছবি আঁকছিল।

বিভা জিজ্ঞাসা করল, "হঠাৎ এখানে যে!"

অভীক বললে, "সংগত কারণ দেখাতে পারি, কিন্তু সেটা হবে গৌণ, মুখ্য কারণটা খুলে বললে সেটা হয়তো সংগত হবে না। আর যাই হোক, সন্দেহ কোরো না যে চুরি করতে এসেছি।"

বিভা তার ডেস্কের চৌকিতে গিয়ে বসল, বললে, "দরকার যদি হয় না-হয় চুরি করলে, পুলিসে খবর দেব না।"

অভীক বললে, "দরকারের হাঁ-করা মুখের সামনে তো নিত্যই আছি। পরের ধন হরণ করা অনেক ক্ষেত্রেই পুণ্যকর্ম, পারি নে পাছে অপবাদটা দাগা দেয় পবিত্র নাস্তিক মতকে। ধার্মিকদের চেয়ে আমাদের অনেক বেশি সাবধানে চলতে হয় আমাদের নেতি দেবতার ইজ্জত বাঁচাতে।"

"অনেকক্ষণ তুমি বসে আছ?"

"তা আছি, বসে বসে সাইকোলজির একটা দুঃসাধ্য প্রব্লেম মনে মনে নাড়াচাড়া করছি যে, তুমি পড়াশুনো করেছ, আর বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বুদ্ধিসুদ্ধিও কিছু আছে, তবু ভগবানকে বিশ্বাস করো কী করে। এখনো সমাধান করতে পারি নি। বোধ হয় বার বার তোমার এই ঘরে এসে এই রিসর্চের কাজটা আমাকে সম্পূর্ণ করে নিতে হবে।"

"আবার বুঝি আমার ধর্মকে নিয়ে লাগলে ?"

"তার কারণ তোমার ধর্ম যে আমাকে নিয়ে লেগেছে। আমাদের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে সেটা মর্মঘাতী। সে আমি ক্ষমা করতে পারি নে। তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারো না, যেহেতু তুমি যাকে বিশ্বাস করো আমি তাকে করি নে বুদ্ধি আছে বলে। কিন্তু তোমাকে বিয়ে করতে আমার তো কোনো বাধা নেই তুমি অবুঝের মতো সত্য মিথ্যে যাই বিশ্বাস করো-না কেন। তুমি তো নাস্তিকের জাত মারতে পারো না। আমার ধর্মের শ্রেষ্ঠতা এইখানে। সব দেবতার চেয়ে তুমি আমার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য, এ কথা ভুলিয়ে দেবার জন্যে একটি দেবতাও নেই আমার সামনে।"

বিভা চুপ করে বসে রইল। খানিক বাদে অভীক বলে উঠল, "তোমার ভগবান কি আমার বাবারই মতো। আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন ?"

"আঃ, কী বকছ।"

অভীক জানে বিয়ে না করার শক্ত কারণটা কোন্‌খানে। কথাটা বিভাকে দিয়ে বলিয়ে নিতে চায়, বিভা চুপ করে থাকে।

জীবনের আরম্ভ থেকেই বিভা তার বাবারই মেয়ে সম্পূর্ণরূপে। এত ভালোবাসা, এত ভক্তি সে আর-কোনো মানুষকে দিতে পারে নি। তার বাপ সতীশও এই মেয়েটির উপরে তাঁর অজস্র স্নেহ ঢেলে দিয়েছেন। তাই নিয়ে ওর মার মনে একটু ঈর্ষা ছিল। বিভা হাঁস পুষেছিল, তিনি কেবলই খিটখিট করে বলেছিলেন, 'ওগুলো বড্ড বেশি ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করে।' বিভা আসমানী রঙের শাড়ি জ্যাকেট করিয়েছিল, মা বলেছিলেন, 'এ কাপড় বিভার রঙে একটুও মানায় না।' বিভা তার মামাতো বোনকে খুব ভালোবাসত। তার বিয়েতে যেতে চাইলেই মা বলে বসলেন, 'সেখানে ম্যালেরিয়া।'

মায়ের কাছ থেকে পদে পদে বাধা পেয়ে পেয়ে বাপের উপরে

বিভার নির্ভর আরো গভীর এবং মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল।

মার মৃত্যু হয় প্রথমেই। তার পরে ওর বাপের সেবা অনেকদিন পর্যন্ত ছিল বিভার জীবনের একমাত্র ব্রত। এই স্নেহশীল বাপের সমস্ত ইচ্ছাকে সে নিজের ইচ্ছা করে নিয়েছে। সতীশ তাঁর বিষয়-সম্পত্তি দিয়ে গেছেন মেয়েকে। কিন্তু ট্রাস্টীর হাতে। নিয়মিত মাস-হারা বরাদ্দ ছিল। মোট টাকাটা ছিল উপযুক্ত পাত্রের উদ্দেশে বিভার বিবাহের অপেক্ষায়। বাপের আদর্শে এই উপযুক্ত পাত্র কে তা বিভা জানত। অন্তত অনুপযুক্ত যে কে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। একদিন অভীক এ কথা তুলেছিল, বলেছিল, "যাঁকে তুমি কষ্ট দিতে চাও না তিনি তো নেই, আর কষ্ট যাকে নিষ্ঠুরভাবে বাজে, সেই লোকটাই আছে বেঁচে। হাওয়ায় তুমি ছুরি মারতে ব্যথা পাও, আর দরদ নেই এই রক্তমাংসের বুকের 'পরে।" শুনে বিভা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। অভীক বুঝেছিল, ভগবানকে নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু বাবাকে নিয়ে নয়।

বেলা প্রায় দশটা। বিভার ভাইঝি সুস্মি এসে বললে, "পিসিমা, বেলা হয়েছে।"

বিভা তার হাতে চাবির গোছা ফেলে দিয়ে বললে, "তুই ভাঁড়ার বের করে দে। আমি এখনি যাচ্ছি।"

বেকারদের কাজের বাঁধা সীমা না থাকাতেই কাজ বেড়ে যায়। বিভার সংসারও সেইরকম। সংসারের দায়িত্ব আত্মীয়পক্ষে হালকা ছিল বলেই অনাত্মীয়পক্ষে হয়েছে বহুবিস্তৃত। এই ওর আপনগড়া সংসারের কাজ নিজের হাতে করাই ওর অভ্যাস, চাকরবাকর পাছে কাউকে অবজ্ঞা করে। অভীক বললে, "অন্যায় হবে তোমার এখনি যাওয়া, কেবল আমার 'পরে নয়, সুস্মির 'পরেও। ওকে স্বাধীন কর্তৃত্বের সময় দাও না কেন। ডোমিনিয়ন স্টাটস্, অন্তত আজকের মতো। তা ছাড়া আমি তোমাকে নিয়ে একটা পরীক্ষা করতে চাই,

কখনো তোমাকে কাজের কথা বলি নি। আজ বলে দেখব। নতুন অভিজ্ঞতা হবে।”

বিভা বললে, “তাই হোক, বাকি থাকে কেন।”

পকেট থেকে অভীক চামড়ার কেস বের করে খুলে দেখালে। একটা কবজিঘড়ি। ঘড়িটা প্লাটিনমের, সোনার মণিবন্ধ, হীরের টুকরোর ছিট দেওয়া। বললে, “তোমাকে বেচতে চাই।”

“অবাক করেছ, বেচবে ?”

“হাঁ, বেচব, আশ্চর্য হও কেন।”

বিভা মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে বললে, “এই ঘড়ি যে মনীষা তোমাকে জন্মদিনে দিয়েছিল। মনে হচ্ছে তার বুকের ব্যথা এখনো ওর মধ্যে ধুকধুক করছে। জানো সে কত দুঃখ পেয়েছিল, কত নিন্দে সয়েছিল আর কত দুঃসাধ্য অপব্যয় করেছিল উপহারটাকে তোমার উপযুক্ত করবার জন্যে ?”

অভীক বললে, “এ ঘুড়ি সেই তো দিয়েছিল, কে দিয়েছে শেষ পর্যন্ত জানতেই দেয় নি। কিন্তু আমি তো পৌত্তলিক নই যে বুকের পকেটে এই জিনিসটার বেদি বাঁধিয়ে মনের মধ্যে দিনরাত শাঁখ ঘণ্টা বাজাতে থাকব।”

“আশ্চর্য করেছ তুমি। এই ক'মাস হল সে টাইফয়েডে—”

“এখন সে তো সুখদুঃখের অতীত।”

“শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে এই বিশ্বাস নিয়ে মরেছিল যে তুমি তাকে ভালোবাসতে।”

“ভুল বিশ্বাস করে নি।”

“তবে ?”

“তবে আবার কী। সে নেই, কিন্তু তার ভালোবাসার দান আজও যদি আমাকে ফল দেয় তার চেয়ে আর কী হতে পারে।”

বিভার মুখে অত্যন্ত একটা পীড়ার লক্ষণ দেখা দিল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, “এত দেশ থাকতে আমার কাছে বেচতে

এলে কেন।”

“কেননা, জানি তুমি দর-কষাকষি করবে না।”

“তার মানে কলকাতার বাজারে আমিই কেবল ঠকবার জন্যে তৈরি হয়ে আছি?”

“তার মানে ভালোবাসা খুশি হয়ে ঠকে।”

এমন মানুষের 'পরে রাগ করা শক্ত, জোরের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে ছেলেমানুষি। কিছুতে যে লজ্জার কারণ আছে তা যেন ও জানেই না। এই ওর অকৃত্রিম অবিবেক, এই যে উচিত-অনুচিতের বেড়া অনায়াসে লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে চলা, এতেই মেয়েদের স্নেহ ওকে এত করে টানে। ভর্ৎসনা করবার জোর পায় না। কর্তব্যবোধকে যারা অত্যন্ত সামলে চলে মেয়েরা তাদের পায়ের ধুলো নেয়। আর যে-সব দুর্দাম দুরন্তের কোনো বালাই নেই ন্যায়-অন্যায়ের, মেয়েরা তাদের বাহুবন্ধনে বাঁধে।

ডেস্কের ব্লটিঙকাগজটার উপর খানিকক্ষণ নীল পেনসিলের দাগকাটা-কাটি করে শেষকালে বিভা বললে, “আচ্ছা, যদি আমার হাতে টাকা থাকে, তবে অমনি তোমাকে দেব। কিন্তু তোমার ঐ ঘড়ি আমি কিছুতেই কিনব না।”

উত্তেজিত কণ্ঠে অভীক বললে, “ভিক্ষা? তোমার সমান ধনী যদি হতুম, তা হলে তোমার দান নিতুম উপহার বলে, দিতুম প্রত্যুপহার সমান-দামের। আচ্ছা, পুরুষের কর্তব্য আমিই বরঞ্চ করছি। এই নাও এই ঘড়ি, এক পয়সাও নেব না।”

বিভা বললে, “মেয়েদের তো নেবারই সম্বন্ধ। তাতে কোনো লজ্জা নেই। তাই বলে এ ঘড়ি নয়। আচ্ছা শুনি, কেন তুমি ওটা বিক্রি করছ।”

“তবে শোনো, তুমি তো জানো, আমার অত্যন্ত বেহায়া একটা ফোর্ড গাড়ি আছে। সেটার চালচলনের ঢিলেমি অসহ্য। কেবল আমি

বলেই ওর দশম দশা ঠেকিয়ে রেখেছি। আটশো টাকা দিলেই ওর বদলে ওর বাপদাদার বয়সী একটা পুরোনো ক্রাইসলার পাবার আশা আছে। তাকে নতুন করে তুলতে পারব আমার নিজের হাতের গুণে।"

"কী হবে ক্রাইসলারের গাড়িতে।"

"বিয়ে করতে যাব না।"

"এমন ভদ্র কাজ তুমি করবে, এ সম্ভব নয়।"

"ধরেছ ঠিক ; তা হলে প্রথমে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি— শীলাকে দেখেছ, কুলদা মিত্তিরের মেয়ে ?"

"দেখেছি তোমারই পাশে যখন-তখন যেখানে-সেখানে।"

"আমার পাশেই ও বুক ফুলিয়ে জায়গা করে নিয়েছে আরো পাঁচজনকে ঠেকিয়ে! ও যে প্রগতিশীলা। ভদ্রসম্প্রদায়ের পিলে চমকে যাবে, এইটেতেই ওর আনন্দ।"

"শুধু কি তাই, মেয়ে-সম্প্রদায়ের বুকে শেল বিঁধবে, তাতেও আনন্দ কম নয়।"

"আমারও মনে ছিল ঐ কথাটা, তোমার মুখে শোনাল ভালো। আচ্ছা মন খুলে বলো, এই মেয়েটির সৌন্দর্য কি অন্যায় রকমের নয়, যাকে বলা যেতে পারে বিধাতার বাড়াবাড়ি।"

"সুন্দরী মেয়ের বেলাতেই বিধাতাকে মানো বুঝি ?"

"নিন্দে করবার দরকার হলে যেমন করে হোক একটা প্রতিপক্ষ খাড়া করতে হয়। দুঃখের দিনে যখন অভিমান করবার তাগিদ পড়েছিল, তখন রামপ্রসাদ মাকে খাড়া করে বলেছিলেন, তোমাকে মা বলে আর ডাকব না। এতদিন ডেকে যা ফল হয়েছিল, না ডেকেও ফল তার চেয়ে বেশি হবে না, মাঝের থেকে নিন্দে করবার ঝাঁজটা ভক্ত মিটিয়ে নিলেন। আমিও নিন্দে করবার বেলায় বিধাতার নাম নিয়েছি।"

"নিন্দে কিসের।"

"বলছি। শীলাকে আমার গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিলুম ফুটবলের মাঠ

থেকে খড়খড় শব্দ করতে করতে পিছনের পদাতিকদের নাসারন্ধ্রে ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে। এমন সময় পাকড়াশি-গিন্নি— ওকে জানো তো, লম্বা গজের অত্যুক্তিতেও ওকে চলনসই বলতে গেলে বিষম খেতে হয়— সে আসছিল কোথা থেকে তার নতুন একটা ফায়াট গাড়িতে। হাত তুলে আমাদের গাড়িটা থামিয়ে দিয়ে পথের মধ্যে খানিকক্ষণ হাঁ-ভাই-ও-ভাই করে নিলে। আর ক্ষণে ক্ষণে আড়ে আড়ে তাকাতে লাগল আমার রঙ-চটে-যাওয়া গাড়ির হুড্ আর জরাজীর্ণ পাদানটার দিকে। তোমাদের ভগবান যদি সাম্যবাদী হতেন, তা হলে মেয়েদের চেহারায় এত বেশি উঁচুনিচু ঘটিয়ে রাস্তায় ঘাটে এরকম মনের আগুন জ্বালিয়ে দিতেন না।”

“তাই বুঝি তুমি—”

“হাঁ, তাই ঠিক করেছি, যত শিগ্‌গির পারি শীলাকে ক্রাইস-লারের গাড়িতে চড়িয়ে পাকড়াশি-গিন্নির নাকের সামনে দিয়ে শিঙা বাজিয়ে চলে যাব। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলো তোমার মনে একটুখানি খোঁচা কি— ”

“আমাকে এর মধ্যে টানো কেন। বিধাতা আমার রূপ নিয়ে তো খুব বেশি বাড়াবাড়ি করেন নি। আর আমার গাড়িখানাও তোমার গাড়িখানার উপর টেক্কা দেবার যোগ্য নয়।”

অভীক তাড়াতাড়ি চৌকি থেকে উঠে মেঝের উপর বিভার পায়ের কাছে বসে তার হাত চেপে ধরে বললে, “কার সঙ্গে কার তুলনা। আশ্চর্য, তুমি আশ্চর্য, আমি বলছি, তুমি আশ্চর্য। আমি তোমাকে দেখি আর আমার ভয় হয় কোন্‌দিন ফস করে মেনে বসব তোমার ভগবানকে। শেষে কোনোকালে আর আমার পরিত্রাণ থাকবে না। তোমার ঈর্ষা আমি কিছুতেই জাগাতে পারলুম না। অন্তত সেটা জানতে দিলে না আমাকে। অথচ তুমি জানো— ”

“চুপ করো। আমি কিছু জানি নে। কেবল জানি অদ্ভুত, তুমি অদ্ভুত, সৃষ্টিকর্তার তুমি অট্টহাসি।”

অভীক বললে, "আমাকে তুমি মুখ ফুটে বলবে না, কিন্তু নিশ্চিত বুঝতে পারি, শীলার সম্বন্ধে তুমি আমার সাইকোলজি জানতে চাও। ওকে আমার ঘোরতর অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। অল্প বয়সে যেমন করে সিগারেট অভ্যাস হয়েছিল। মাথা ঘুরত তবু ছাড়তুম না। মুখে লাগত তিতো, মনে লাগত গর্ব। ও জানে কী করে দিনে দিনে মৌতাত জমিয়ে তুলতে হয়। মেয়েদের ভালোবাসায় যে মদটুকু আছে, সেটাতে আমার ইন্‌স্পিরেশন। আমি আর্টিস্ট। ও যে আমার পালের হাওয়া। ও নইলে আমার তুলি যায় আটকে বালির চরে। বুঝতে পারি, আমার পাশে বসলে শীলার হৃৎপিণ্ডে একটা লালরঙের আগুন জ্বলতে থাকে, ডেন্‌জার সিগ্‌নাল, তার তেজ প্রবেশ করে আমার শিরায় শিরায়।— দোষ নিয়ো না তপস্বিনী, ভাবছ সেটাতে আমার বিলাস, না গো না, সেটাতে আমার প্রয়োজন।"

"তাই তোমার এত প্রয়োজন ক্রাইসলারের গাড়িতে।"

"তা স্বীকার করব। শীলার মধ্যে যখন গর্ব জাগে তখন ওর ঝলক বাড়ে। মেয়েদের এত গয়না কাপড় জোগাতে হয় সেই-জন্যেই। আমরা চাই মেয়েদের মাধুর্য, ওরা চায় পুরুষের ঐশ্বর্য। তারই সোনালি পূর্ণতার উপরে ওদের প্রকাশের ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড। প্রকৃতির এই ফন্দি পুরুষদের বড়ো করে তোলবার জন্যে। সত্যি কি না বলো।"

"সত্যি হতে পারে। কিন্তু কাকে বলে ঐশ্বর্য তাই নিয়ে তর্ক। ক্রাইসলারের গাড়িকে যারা ঐশ্বর্য বলে, আমি তো বলি, তারা পুরুষকে ছোটো করবার দিকে টানে।"

অভীক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "জানি জানি, তুমি যাকে ঐশ্বর্য বলো তারই সর্বোচ্চ চূড়ায় তুমি আমাকে পৌঁছিয়ে দিতে পারতে। তোমার ভগবান মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।"

অভীকের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিভা বললে, "ঐ এক কথা বার বার বোলো না। আমি তো বরাবর উলটোই শুনেছি। বিয়েটা

আর্টিস্টের পক্ষে গলার ফাঁস। ইন্‌স্পিরেশনের দম বন্ধ করে দেয়। তোমাকে বড়ো করতে যদি পারতুম আমার যদি সে শক্তি থাকত তা হলে।—"

অভীক ঝেঁকে উঠে বললে, "পারতুম কী, পেরেছ। আমার এই দুঃখু যে আমার সেই ঐশ্বর্য তুমি চিনতে পারো নি। যদি পারতে তা হলে তোমার ধর্মকর্মের সব বাঁধন ছিঁড়ে আমার সঙ্গিনী হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াতে ; কোনো বাধা মানতে না। তরী তীরে এসে পৌঁছয় তবু যাত্রী তীর্থে ওঠবার ঘাট খুঁজে পায় না। আমার হয়েছে সেই দশা। বী, আমার মধুকরী, কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে আবিষ্কার করবে বলো।"

"যখন আমাকে তোমার আর দরকার হবে না।"

"ও-সব অত্যন্ত ফাঁপা কথা। অনেকখানি মিথ্যের হাওয়া দিয়ে ফুলিয়ে তোলা। স্বীকার করো, 'আমাকে না হলে নয়' বলে জেনেই উৎকণ্ঠিত তোমার সমস্ত দেহমন। সে কি আমার কাছে লুকোবে।"

"এ কথা বলেই বা কী হবে, লুকোবই বা কেন। মনে যাই থাক্, আমি কাঙালপনা করতে চাই নে।"

"আমি চাই, আমি কাঙাল। আমি দিনরাত বলব, আমি চাই, আমি তোমাকেই চাই।"

"আর সেইসঙ্গে বলবে, আমি ক্রাইসলারের গাড়িও চাই।"

"ঐ তো, ওটা তো জেলাসি। পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ। মাঝে মাঝে ঘনিয়ে উঠুক ধোঁয়া জেলাসির, প্রমাণ হোক ভালোবাসার অন্তর্গূঢ় আগুন। নিবে-যাওয়া ভল্‌ক্যানো নয় তোমার মন। তাজা ভিস্যুভিয়স।"

ব'লে দাঁড়িয়ে উঠে অভীক হাত তুলে বললে, "হুর্‌রে।"

"এ কী ছেলেমানুষি করছ। এইজন্যেই বুঝি আজ সকালবেলায় এসেছিলে আগে থাকতে প্ল্যান করে ?"

"হাঁ এইজন্যেই। মানছি সে কথা। নইলে এমন মুগ্ধ কেউ কেউ

জানা আছে যাকে এ ঘড়ি এখনি বেচতে পারি বিনা ওজরে অন্যায় দামে। কিন্তু তোমার কাছে কেবল তো দাম চাইতে আসি নি, যেখানে তোমার ব্যথার উৎস সেখানে ঘা মেরে অঞ্জলি পাততে চেয়েছিলেম। কিন্তু হতভাগার ভাগ্যে না হল এটা, না হল ওটা।"

"কেমন করে জানলে। ভাগ্য তো সব সময় দেখাবিন্তি খেলে না। কিন্তু দেখো, একটা কথা তোমাকে বলি— তুমি মাঝে-মাঝে আমাকে জিগ্‌গেসা করেছ তোমার লীলাখেলা দেখে আমার মনে খোঁচা লাগে কি না। সত্য কথা বলি, লাগে খোঁচা।"

অভীক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "এটা তো সুসংবাদ।"

বিভা বললে, "অত উৎফুল্ল হোয়ো না। এ জেলাসি নয়, এ অপমান। মেয়েদের নিয়ে তোমার এই গায়ে-পড়া সখ্য, এই অসভ্য অসংকোচ, এতে সমস্ত মেয়েজাতের প্রতি তোমার অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। আমার ভালো লাগে না।"

"এ তোমার কী রকম কথা হল। শ্রদ্ধার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব নেই? জাতকে-জাত যেখানে যাকেই দেখব শ্রদ্ধা করে করে বেড়াব? মাল যাচাই নেই, একেবারে wholesale শ্রদ্ধা? একে বলে protection, ব্যাবসাদারিতে বাইরে থেকে কৃত্রিম মাসুল চাপিয়ে দর বাড়ানো।"

"মিথ্যে তর্ক কোরো না।"

"অর্থাৎ তুমি তর্ক করবে, আমি করব না। একেই বলে, 'দিন ভয়ংকর, মেয়েরা বাক্য কবে কিন্তু পুরুষরা রবে নিরুত্তর'।"

"অভী, তুমি কেবলই কথা-কাটাকাটি করবার অছিলা খুঁজছ। বেশ জানো আমি বলতে চাইছিলুম, মেয়েদের থেকে স্বভাবত একটা দূরত্ব বাঁচিয়ে চলাই পুরুষের পক্ষে ভদ্রতা।"

"স্বভাবত দূরত্ব বাঁচানো, না, অস্বভাবত? আমরা মডার্ন, মেকি ভদ্রতা মানি নে, খাঁটি স্বভাবকে মানি। শীলাকে পাশে নিয়ে ঝাঁকানি-দেওয়া ফোর্ড়গাড়ি চালাই, স্বাভাবিকতা হচ্ছে তার পাশা-

পাশিটাই। ভদ্রতার খাতিরে মাঝখানে দেড়হাত জায়গা রাখলে অশ্রদ্ধা করা হত স্বভাবকে।"

"অভী, তোমরা নিজের থেকে মেয়েদের বিশেষ মূল্য দিয়ে দামী করে তুলেছিলে, তাদের খেলো করো নি নিজের গরজেই। সেই দাম আজ যদি ফিরিয়ে নাও নিজের খুশিকেই করবে শস্তা, ফাঁকি দেবে নিজের পাওনাকেই। কিন্তু মিথ্যে বকছি, মডার্ন কালটাই খেলো।"

অভীক জবাব দিলে, "খেলো বলব না, বলব বেহায়া। সেকালের বুড়োশিব চোখ বুজে বসেছেন ধ্যানে, একালের নন্দীভৃঙ্গী আয়না হাতে নিয়ে নিজেদের চেহারাকে ব্যঙ্গ করছে— যাকে বলে debunking। জন্মেছি একালে, বোম্‌ভোলানাথের চেলা হয়ে কপালে চোখ তুলে বসে থাকতে পারব না; নন্দীভৃঙ্গীর বিদঘুটে মুখভঙ্গির নকল করতে পারলে আজকের দিনে নাম হবে।"

"আচ্ছা আচ্ছা, যাও নাম করতে দশ দিককে মুখ ভেঙচিয়ে। কিন্তু তার আগে আমাকে একটা কথা সত্যি করে বলো, তোমার কাছে আশকারা পেয়ে রাজ্যের যত মেয়ে তোমাকে নিয়ে এই-যে টানাটানি করে এতে কি তোমার ভালোলাগার ধার ভোঁতা হয়ে যায় না? তোমরা কথায় কথায় যাকে বলো thrill, ঠেলাঠেলিতে তাকে কি পায়ের নীচে দ'লে ফেলা হয় না?"

"সত্যি কথাই বলি তবে, বী, যাকে বলে thrill, যাকে বলে ecstasy, সে হল পয়লা নম্বরের জিনিস, ভাগ্যে দৈবাৎ মেলে। কিন্তু তুমি যাকে বলছ ভিড়ের মধ্যে টানাটানি, সে হল সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড দোকানের মাল, কোথাও বা দাগী, কোথাও বা ছেঁড়া, কিন্তু বাজারে সেও বিকোয়— অল্প দামে। সেরা জিনিসের পুরো দাম দিতে পারে ক'জন ধনী?"

"তুমি পারো অভী, নিশ্চয় পারো, পুরো মূল্য আছে তোমার হাতে। কিন্তু অদ্ভুত তোমার স্বভাব, ছেঁড়া জিনিসে ময়লা জিনিসে

তোমাদের আর্টিস্টের একটা কৌতুক আছে, কৌতূহল আছে। সুসম্পূর্ণ জিনিস তোমাদের কাছে picturesque নয়। থাক্‌গে এ-সব বৃথা তর্ক। আপাতত ক্রাইসলারের পালাটা যতদূর সম্ভব এগিয়ে দেওয়া যাক।"

এই বলে চৌকি ছেড়ে বিভা পাশের ঘরে চলে গেল। ফিরে এসে অভীকের হাতে একতাড়া নোট দিয়ে বললে, "এই নাও তোমার ইন্‌স্পিরেশন, কোম্পানি-বাহাদুরের মার্কামারা। কিন্তু তাই বলে তোমার ঐ ঘড়ি আমাকে নিতে বোলো না।"

চৌকিতে মাথা রেখে অভীক মেঝের উপরে বসে রইল। বিভা দ্রুতপদে তার হাত টেনে নিয়ে বললে, "আমাকে ভুল বুঝো না। তোমার অভাব ঘটেছে। আমার অভাব নেই এমন সুযোগে— "

বিভাকে থামিয়ে দিয়ে অভীক বললে, "অভাব আছে আমার, দারুণ অভাব। তোমার হাতেই রয়েছে সুযোগ, তা পূরণ করবার। কী হবে টাকায়।"

বিভা অভীকের হাতের উপরে স্নিগ্ধভাবে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, "যা পারি নে তার দুঃখ রইল আমার মনে চিরদিন। যতটুকু পারি তার সুখ থেকে কেন আমাকে বঞ্চিত করবে।"

"না না না, কিছুতেই না। তোমারই কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে শীলাকে আমি গাড়ি চড়িয়ে বেড়াব? এ প্রস্তাবে ধিক্কার দেবে এই ভেবেছিলুম, রাগ করবে এই ছিল আশা।"

"রাগ করব কেন। তোমার দুষ্টুমি কতক্ষণের। এটা সাংঘাতিক শীলার পক্ষে, তোমার পক্ষে একটুও না। এমন ছেলেমানুষি কতবার তোমার দেখেছি, মনে মনে হেসেছি। জানি কিছুদিনের মতো এ খেলা না হলে তোমার চলে না। এও জানি স্থায়ী হলে আরো অচল হয়। হয়তো তুমি কিছু পেতে চাও, কিন্তু তোমাকে কিছু পাবে এ সইতে পারো না।"

"বী, আমাকে তুমি অত্যন্ত বেশি জানো তাই এমন ঘোরতর

নিশ্চিন্ত থাকো। জানতে পেরেছ আমার ভালো লাগে মেয়েদের কিন্তু সে ভালো-লাগা নাস্তিকেরই, তাতে বাঁধন নেই। পাথরে-গাঁথা মন্দিরে সে পূজাকে বন্দী করব না। বান্ধবীদের সঙ্গে গলাগলির গদ্‌গদ দৃশ্য মাঝে-মাঝে দেখেছি, সেই বিহ্বল স্ত্রৈণতায় আমার গা কেমন করে। কিন্তু মেয়েরা আমার কাছে নাস্তিকের দেবতা, অর্থাৎ আর্টিস্টের। আর্টিস্ট খাবি খেয়ে মরে না, সে সাঁতার দেয়, দিয়ে অনায়াসে পার হয়ে যায়। আমি লোভী নই, আমাকে নিয়ে যে মেয়ে ঈর্ষা করে সে লোভী। তুমি লোভী নও, তোমার নিরাসক্ত মনের সবচেয়ে বড়ো দান স্বাধীনতা।"

বিভা হেসে বললে, "তোমার স্তব এখন রাখো। আর্টিস্ট, তোমরা সাবালক শিশু, এবার যে খেলাটা ফেঁদেছ তার খেলনাটি না-হয় আমার হাত থেকেই নেবে।"

"নৈব নৈব চ। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার ট্রাস্টীদের মুঠো থেকে এ টাকা খসিয়ে নিলে কী করে।"

"খোলসা করে বললে হয়তো খুশি হবে না। তুমি জানো অমরবাবুর কাছে আমি ম্যাথামেটিক্‌স শিখছি।"

"সব-তাতেই আমাকে বহুদূরে এড়িয়ে যেতে চাও, বিদ্যেতেও?"

"বোকো না, শোনো। আমার ট্রাস্টীদের মধ্যে একজন আছেন আদিত্যমামা। নিজে তিনি গণিতে ফর্স্ট ক্লাস মেডালিস্ট। তাঁর বিশ্বাস, যথেষ্ট সুযোগ পেলে অমরবাবু দ্বিতীয় রামানুজম হবেন। ওঁর কষা একটুখানি প্রবলেম আইনস্টাইনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যা উত্তর পেয়েছিলেন সেটা আমি দেখেছি। এমন লোককে সাহায্য করতে হলে তাঁর মান বাঁচিয়ে করতে হয়। আমি তাই বললুম ওঁর কাছে গণিত শিখব। মামা খুব খুশি। শিক্ষাখাতে ট্রাস্টফাণ্ড থেকে কিছু থোক টাকা আমার হাতে রেখে দিয়েছেন। তারই থেকে আমি ওঁকে বৃত্তি দিই।"

অভীকের মুখ কেমন একরকম হয়ে গেল। একটু হাসবার চেষ্টা

করে বললে, "এমন আর্টিস্টও হয়তো আছে যে উপযুক্ত সুযোগ পেলে মিকেল আঞ্জেলোর অন্তত দাড়ির কাছটাতে পৌঁছতে পারত।"

"কোনো সুযোগ না পেলেও হয়তো পারবে পৌঁছতে। এখন বলো আমার কাছ থেকে টাকাটা নেবে কি না।"

"খেলনার দাম ?"

"হাঁ গো, আমরা তো চিরকাল তোমাদের খেলনার দামই দিয়ে থাকি। তাতে দোষ কী। তার পরে আছে আঁস্তাকুড়।"

"ক্রাইসলারের আজ শ্রাদ্ধশান্তি হল এইখানেই। প্রগতিশীলার প্রগতিবেগ ভাঙা ফোর্ডেই নড়নড় করতে করতে চলুক। এখন ও-সব-কথা আর ভালো লাগছে না। অমরবাবু শুনেছি টাকা জমাচ্ছেন বিলেতে যাবার জন্যে, সেখান থেকে প্রমাণ করে আসবেন তিনি সামান্য লোক নন।"

বিভা বললে, "একান্ত আশা করি, তাই যেন ঘটে। তাতে দেশের গৌরব।"

উচ্চকণ্ঠে বললে অভীক, "আমাকেও তাই প্রমাণ করতে হবে, তুমি আশা কর আর নাই কর। ওঁর প্রমাণ সহজ, লজিকের বাঁধা রাস্তায়, আর্টের প্রমাণ রুচির পথে, সে রসিক লোকের প্রাইভেট পথ। সে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নয়। আমাদের এই চোখে-ঠুলি-পরা ঘানি-ঘোরানোর দেশে আমার চলবে না। যাদের দেখবার স্বাধীন দৃষ্টি আছে, আমি যাবই তাদের দেশে। একদিন তোমার মামাকে যেন বলতে হয়, আমিও সামান্য লোক নই, আর তাঁর ভাগনীকেও—"

"ভাগনীর কথা বোলো না। তুমি মিকেল আঞ্জেলোর সমান মাপের কি না তা জানবার জন্যে তাকে সবুর করতে হয় নি। তার কাছে তুমি বিনা প্রমাণেই অসামান্য। এখন বলো, তুমি যেতে চাও বিলেতে ?"

"সে আমার দিনরাত্রির স্বপ্ন।"

"তা হলে নাও-না আমার এই দান। প্রতিভার পায়ে এই সামান্য আমার রাজকর।"

"থাক্ থাক্, ও কথা থাক্ ; কানে ঠিক সুর লাগছে না। সার্থক হোক গণিত-অধ্যাপকের মহিমা। আমার জন্যে এ যুগ না হোক পরযুগ আছে, অপেক্ষা করে থাকবে পস্টারিটি। এই আমি বলে দিচ্ছি, একদিন আসবে যেদিন অর্ধেক রাত্রে বালিশে মুখ গুঁজে তোমাকে বলতে হবে, নামের সঙ্গে নাম গাঁথা হতে পারত চির-কালের মতো, কিন্তু হল না।"

"পস্টারিটির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না অভী, নিষ্ঠুর শাস্তি আমার আরম্ভ হয়েছে।"

"কোন্ শাস্তির কথা তুমি বলছ জানি নে, কিন্তু জানি তোমার সবচেয়ে বড়ো শাস্তি তুমি বুঝতে পার নি আমার ছবি। এসেছে নতুন যুগ, সেই যুগের বরণসভায় আধুনিক বড়ো চৌকিটাতে আমার দেখা তোমার মিলল না।" বলেই অভীক উঠে চলল দরজার দিকে।

বিভা বললে, "যাচ্ছ কোথায়।"

"মিটিং আছে।"

"কিসের মিটিং।"

"ছুটির সময়কার ছাত্রদের নিয়ে দুর্গাপূজা করব।"

"তুমি পুজো করবে ?"

"আমিই করব। আমি যে কিছুই মানি নে। আমার সেই না-মানার ফাঁকার মধ্যে তেত্রিশ কোটি দেবতা আর অপদেবতার জায়গার টানাটানি হবে না। বিশ্বসৃষ্টির সমস্ত ছেলেখেলা ধরাবার জন্যে আকাশ শূন্য হয়ে আছে।"

বিভা বুঝল বিভারই ভগবানের বিরুদ্ধে ওর এই বিদ্রূপ। কোনো তর্ক না করে সে মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইল।

অভীক দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে বললে, "দেখো বী, তুমি প্রচণ্ড ন্যাশনালিস্ট। ভারতবর্ষে ঐক্যস্থাপনের স্বপ্ন দেখো। কিন্তু যে

দেশে দিনরাত্রি ধর্ম নিয়ে খুনোখুনি সে দেশে সব ধর্মকে মেলাবার পুণ্যব্রত আমার মতো নাস্তিকেরই। আমিই ভারতবর্ষের ত্রাণকর্তা।"

অভীকের নাস্তিকতা কেন যে এত হিংস্র হয়ে উঠেছে বিভা তা জানে। তাই তার উপরে রাগ করতে পারে না। কিছুতে ভেবে পায় না কী হবে এর পরিণাম। বিভার আর যা-কিছু আছে সবই সে দিতে পারে, কেবল ঠেকেছে ওর পিতার ইচ্ছায়। সে ইচ্ছা তো মত নয়, বিশ্বাস নয়, তর্কের বিষয় নয়। সে ওর স্বভাবের অঙ্গ। তার প্রতিবাদ চলে না। বার বার মনে করেছে এই বাধা সে লঙ্ঘন করবে। কিন্তু শেষমুহূর্তে কিছুতে তার পা সরতে চায় না।

বেহারা এসে খবর দিলে, অমরবাবু এসেছেন। অভীক অবিলম্বে দুড়দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে চলে গেল। বিভার বুকের মধ্যে মোচড়াতে লাগল। প্রথমটাতে ভাবলে অধ্যাপককে বলে পাঠাই, আজ পাঠ নেওয়া হবে না। পরক্ষণেই মনটাকে শক্ত করে বললে, "আচ্ছা, এইখানে নিয়ে আয়। বসতে বল্। একটু বাদেই আসছি।"

শোবার ঘরে উপুড় হয়ে বিছানায় গিয়ে পড়ল। বালিশ আঁকড়ে ধরে কান্না। অনেকক্ষণ পরে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে মুখে-চোখে জল দিয়ে হাসিমুখে ঘরে এসে বললে, "আজ মনে করেছিলুম ফাঁকি দেব।"

"শরীর ভালো নেই বুঝি?"

"না, বেশ আছে। আসল কথা, কতকাল ধরে রবিবারের ছুটি রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে, থেকে থেকে তার প্রকোপ প্রবল হয়ে ওঠে।"

অধ্যাপক বললেন, "আমার রক্তে এ পর্যন্ত ছুটির মাইক্রোব ঢোকবার সময় পায় নি। কিন্তু আমিও আজ ছুটি নেব। কারণটা বুঝিয়ে বলি। এ-বছর কোপেনহেগেনে সার্বজাতিক ম্যাথামেটিক্স কনফারেন্স হবে। আমার নাম কী করে ওদের নজরে পড়ল জানি নে। ভারতবর্ষের মধ্যে আমিই নিমন্ত্রণ পেয়েছি। এতবড়ো সুযোগ

তো ব্যর্থ হতে দিতে পারি নে।”

বিভা উৎসাহের সঙ্গে বললে, “নিশ্চয় আপনাকে যেতে হবে।”

অধ্যাপক একটুখানি হেসে বললেন, “আমার উপরওয়ালা যাঁরা আমাকে ডেপুটেশনে পাঠাতে পারতেন তাঁরা রাজি নন, পাছে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। অতএব তাঁদের সেই উৎকণ্ঠা আমার ভালোর জন্যেই। তেমন কোনো বন্ধু যদি পাই যে লোকটা খুব বেশি সেয়ানা নয়, তারই সন্ধানে আজ বেরব। ধারের বদলে যা বন্ধক দেবার আশা দিতে পারি সেটাকে না পারব দাঁড়িপাল্লায় চড়াতে, না পারব কষ্টিপাথরে ঘষে দেখাতে। আমরা বিজ্ঞানীরা কিছু বিশ্বাস করবার পূর্বে প্রত্যক্ষপ্রমাণ খুঁজি, বিষয়বুদ্ধিওয়ালারাও খোঁজে—ঠকাবার জো নেই কাউকে।”

বিভা উত্তেজিত হয়ে বললে, “যেখান থেকে হোক, বন্ধু একজনকে বের করবই, হয়তো সে খুব সেয়ানা নয়, সেজন্যে ভাববেন না।”

দু-চার কথায় সমস্যার মীমাংসা হয় নি। সেদিনকার মতো একটা আধাখেঁচড়া নিষ্পত্তি হল। অমরবাবু লোকটি মাঝারি সাইজের, শ্যামবর্ণ, দেহটি রোগা, কপাল চওড়া, মাথার সামনেদিককার চুল ফুরফুরে হয়ে এসেছে। মুখটি প্রিয়দর্শন, দেখে বোঝা যায় কারো সঙ্গে শত্রুতা করবার অবকাশ পান নি। চোখদুটিতে ঠিক অন্যমনস্কতা নয়, যাকে বলা যেতে পারে দূরমনস্কতা—অর্থাৎ রাস্তায় চলবার সময় ওঁকে নিরাপদ রাখবার দায়িত্ব বাইরের লোকদেরই। বন্ধু ওঁর খুব অল্পই, কিন্তু যে-কজন আছে তারা ওঁর সম্বন্ধে খুবই উচ্চ আশা রাখে, আর বাকি যে-সব চেনা লোক তারা নাক সিটকে ওঁকে বলে হাইব্রাউ। কথাবার্তা অল্প বলেন, সেটাকে লোকে মনে করে হৃদ্যতারই স্বল্পতা। মোটের উপর ওঁর জীবনযাত্রায় জনতা খুব কম। তাঁর সাইকোলজির পক্ষে আরামের বিষয় এই যে দশজনে ওঁকে কী ভাবে সে উনি জানেনই না।

অভীকের কাছে বিভা আজ তাড়াতাড়ি যে আটশো টাকা এনে দিয়েছিল সে একটা অন্ধ আবেগে মরিয়া হয়ে। বিভার নিয়মনিষ্ঠার প্রতি তার মামার বিশ্বাস অটল। কখনো তার ব্যত্যয় হয় নি। মেয়েদের জীবনে নিয়মের প্রবল ব্যতিক্রমের ঝটকা হঠাৎ কোন্ দিক থেকে এসে পড়ে, তিনি বিষয়ী লোক সেটা কল্পনাও করতে পারেন নি। এই অকস্মাৎ অকাজের সমস্ত শাস্তি ও লজ্জা মনের মধ্যে স্পষ্ট করে দেখে নিয়েই এক মুহূর্তের ঝড়ের ঝাপটে বিভা উপস্থিত করেছিল তার উৎসর্গ অভীকের কাছে। প্রত্যাখ্যাত সেই দান আবার নিয়মের পিল্‌পেগাড়ির মধ্যে ফিরে এসেছে। বর্তমান ক্ষেত্রে ভালোবাসার সেই স্পর্ধাবেগ তার মনে নেই। স্বাধিকার লঙ্ঘন করে কাউকে টাকা ধার দেবার কথা সে সাহস করে মনে আনতে পারলে না। তাই বিভা প্ল্যান করেছে, মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া দামী গয়না বেচে যা পাবে সেই টাকা অমরকে উপলক্ষ করে দেবে আপন স্বদেশকে।

বিভার কাছে যে-সব ছেলেমেয়ে মানুষ হচ্ছে, ও তাদের পড়ায় সাহায্য করে। আজ রবিবার। খাওয়ার পরে এতক্ষণ ওর ক্লাস বসেছিল। সকাল-সকাল দিল ছুটি।

বাক্স বের করে মেঝের উপর একখানা কাঁথা পেতে তাতে একে একে বিভা গয়না সাজাচ্ছিল। ওদের পরিবারের পরিচিত জহুরীকে ডেকে পাঠিয়েছে।

এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেল অভীকের। প্রথমেই গয়নাগুলো তাড়াতাড়ি লুকোবার ঝোঁক হল, কিন্তু যেমন পাতা ছিল তেমনি রেখে দিলে। কোনো কারণেই অভীকের কাছে কোনো-কিছু চাপা দেবে, সে ওর স্বভাবের বিরুদ্ধে।

অভীক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, বুঝল ব্যাপারখানা কী। বললে, "অসামান্যের পারানি কড়ি।

আমার বেলায় তুমি মহামায়া, ভুলিয়ে রাখ ; অধ্যাপকের বেলায় তুমি তারা, তরিয়ে দাও। অধ্যাপক জানেন কি, অবলা নারী মৃণালভুজে তাঁকে পারে পাঠাবার উপায় করেছে ?"

"না, জানেন না।"

"জানলে কি এই বৈজ্ঞানিকের পৌরুষে ঘা লাগবে না।"

"ক্ষুদ্র লোকের শ্রদ্ধার দানে মহৎ লোকের অকুণ্ঠিত অধিকার, আমি তো এই জানি। এই অধিকার দিয়ে তাঁরা অনুগ্রহ করেন, দয়া করেন।"

"সে কথা বুঝলুম, কিন্তু মেয়েদের গায়ের গয়না আমাদেরই আনন্দ দেবার জন্যে, আমরা যত সামান্যই হই, কারো বিলেত যাবার জন্যে নয়, তিনি যত বড়োই হোন-না। আমাদের মতো পুরুষদের দৃষ্টিকে এ তোমরা প্রথম থেকেই উৎসর্গ করে রেখেছ। এই হারখানি চুনির সঙ্গে মুক্তোর মিল করা, এ আমি একদিন তোমার গলায় দেখেছিলেম, যখন আমাদের পরিচয় ছিল অল্প। সেই প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিতে এই হারখানি এক হয়ে মিশিয়ে আছে। ঐ হার কি একলা তোমার, ও-যে আমারও।"

"আচ্ছা, ঐ হারটা না-হয় তুমিই নিলে।"

"তোমার সত্তা থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হার একেবারেই যে নিরর্থক। সে যে হবে চুরি। তোমার সঙ্গে নেব ওকে সবসুদ্ধু, সেই প্রত্যাশা করেই বসে আছি। ইতিমধ্যে ঐ হার হস্তান্তর করো যদি, তবে ফাঁকি দেবে আমাকে।"

"গয়নাগুলো মা দিয়ে গেছেন আমার ভাবী বিবাহের যৌতুক। বিবাহটা বাদ দিলে ও গয়নার কী সংজ্ঞা দেব। যাই হোক, কোনো শুভ কিংবা অশুভ লগ্নে এই কন্যাটির সালংকারা মূর্তি আশা কোরো না।"

"অন্যত্র পাত্র স্থির হয়ে গেছে বুঝি ?"

"হয়েছে বৈতরণীর তীরে। বরঞ্চ এক কাজ করতে পারি, তুমি

যাকে বিয়ে করবে সেই বধূর জন্যে আমার এই গয়না কিছু রেখে যাব।”

“আমার জন্যে বুঝি বৈতরণীর তীরে বধূর রাস্তা নেই ?”

“ও কথা বোলো না। সজীব পাত্রী সব আঁকড়ে আছে তোমার কুষ্ঠি।”

“মিথ্যে কথা বলব না। কুষ্ঠির ইশারাটা একবার অসম্ভব নয়। শনির দশায় সঙ্গিনীর অভাব হঠাৎ মারাত্মক হয়ে উঠলে পুরুষের আসে ফাঁড়ার দিন।”

“তা হতে পারে, কিন্তু তার কিছুকাল পরেই সঙ্গিনীর আবির্ভাব-টাই হয় মারাত্মক। তখন ঐ ফাঁড়াটা হয়ে ওঠে মুশকিলের। যাকে বলে পরিস্থিতি।”

“ঐ যাকে বলে বাধ্যতামূলক উদ্‌বন্ধন। প্রসঙ্গটা যদিচ হাই-পথেটিক্যাল, তবু সম্ভাবনার এত কাছঘেঁষা যে এ নিয়ে তর্ক করা মিথ্যে। তাই বলছি, একদিন যখন লালচেলি-পরা আমাকে হঠাৎ দেখবে পরহস্তগতং ধনং তখন—”

“আর ভয় দেখিয়ো না, তখন আমিও হঠাৎ আবিষ্কার করব, পর-হস্তের অভাব নেই।”

“ছি ছি মধুকরী, কথাটা তো ভালো শোনাল না তোমার মুখে। পুরুষেরা তোমাদের দেবী বলে স্তুতি করে, কেননা তাদের অন্তর্ধান ঘটলে তোমরা শুকিয়ে মরতে রাজি থাকো। পুরুষদের ভুলেও কেউ দেবতা বলে না। কেননা অভাবে পড়লেই বুদ্ধিমানের মতো অভাব পূরণ করিয়ে নিতে তারা প্রস্তুত। সম্মানের মুশকিল তো ঐ। একনিষ্ঠতার পদবিটা বাঁচাতে গিয়ে তোমাদের প্রাণে মরতে হয়। সাইকোলজি এখন থাক্, আমার প্রস্তাব এই, অমরবাবুর অমরত্ব-লাভের দায়িত্ব আমাদেরই উপরে দাও-না, আমরা কি ওর মূল্য বুঝি নে। গয়না বেচে পুরুষকে লজ্জা দাও কেন।”

“ও কথা বোলো না। পুরুষদের যশ মেয়েদেরই সবচেয়ে বড়ো

সম্পদ। যে দেশে তোমরা বড়ো সে দেশে আমরা ধন্য।"

"এ দেশ সেই দেশই হোক। তোমাদের দিকে তাকিয়ে সেই কথাই ভাবি প্রাণপণে। এ প্রসঙ্গে আমার কথাটা এখন থাক্, অন্য একসময় হবে। অমরবাবুর সফলতায় ঈর্ষা করে এমন খুদে লোক বাংলাদেশে অনেক আছে। এ দেশের মানুষরা বড়োলোকের মড়ক। কিন্তু দোহাই তোমার, আমাকে সেই বামনদের দলে ফেলো না। শোনো, আমি কত বড়ো একটা ক্রিমিন্যাল পুণ্যকর্ম করেছি।— দুর্গাপূজার চাঁদার টাকা আমার হাতে ছিল। সে টাকা দিয়ে দিয়েছি অমরবাবুর বিলেতযাত্রার ফণ্ডে। দিয়েছি কাউকে না বলে। যখন ফাঁস হবে, জীববলি খোঁজবার জন্যে মায়ের ভক্তদের বাজারে দৌড়তে হবে না। আমি নাস্তিক, আমি বুঝি সত্যকার পূজা কাকে বলে। ওরা ধর্মপ্রাণ, ওরা কী বুঝবে।"

"এ কী কাজ করলে অভীক। তুমি যাকে বল তোমার পবিত্র নাস্তিক ধর্ম এ কাজ কি তার যোগ্য, এ যে বিশ্বাসঘাতকতা।"

"মানি। কিন্তু আমার ধর্মের ভিত কিসে দুর্বল করে দিয়েছিল তা বলি। খুব ধুম করে পূজা দেবে বলে আমার চেলারা কোমর বেঁধেছিল। কিন্তু চাঁদার যে সামান্য টাকা উঠল সে যেমন হাস্যকর তেমন শোকাবহ। তাতে ভোগের পাঁঠাদের মধ্যে বিয়োগান্ত নাট্য জমত না, পঞ্চমাঙ্কের লাল রঙটা হত ফিকে। আমার তাতে আপত্তি ছিল না। স্থির করেছিলেম নিজেরাই কাঠি-হাতে ঢাকে ঢোলে বেতালা চাঁটি লাগাব অসহ্য উৎসাহে, আর লাউকুমড়োর বক্ষ বিদীর্ণ করব স্বহস্তে খড়্গাঘাতে। নাস্তিকের পক্ষে এই যথেষ্ট, কিন্তু ধর্মপ্রাণের পক্ষে নয়। কখন সন্ধ্যাবেলায় আমাকে না জানিয়ে ওদের একজন সাজল সাধুবাবা, পাঁচজন সাজল চেলা। কোনো একজন ধনী বিধবা বুড়িকে গিয়ে বললে, তার যে-ছেলে রেঙ্গুনে কাজ করে, জগদম্বা স্বপ্ন দিয়েছেন, যথেষ্ট পাঁঠা আর পুরোবহরের পুজো না পেলে মা তাঁকে আস্ত খাবেন। তাঁর কাছ থেকে স্ক্রু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাঁচ হাজার টাকা বের করেছে।

যেদিন শুনলুম, সেইদিনই টাকাটার সৎকার করেছি। তাতে আমার জাত গেল। কিন্তু টাকাটার কলঙ্ক ঘুচল। এই তোমাকে কবুল করলুম আমার কন্‌ফেশনাল। পাপ কবুল করে পাপ ক্ষালন করে নেওয়া গেল। পাঁচ হাজার টাকার বাইরে আছে উনত্রিশটি মাত্র টাকা। সে রেখেছি কুমড়োর বাজারের দেনাশোধের জন্য।

স্মুস্মি এসে বললে, "বচ্চু বেহারার জ্বর বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে কাশি, ডাক্তারবাবু কী লিখে দিয়ে গেছেন, দেখে দাও-সে।"

বিভার হাত চেপে ধরে অভীক বললে, "বিশ্বহিতৈষিণী, রোগ-তাপের তদ্‌বির করতে দিনরাত ব্যস্ত আছ, আর যে-সব হতভাগার শরীর অতি বিশ্রী রকমে সুস্থ তাদের মনে করবার সময় পাও না?"

"বিশ্বহিত নয় গো, কোনো একজন অতি সুস্থ হতভাগ্যকে ভুলে থাকবার জন্যেই এত করে কাজ বানাতে হয়। এখন ছাড়ো, আমি যাই, তুমি একটু বোসো, আমার গয়না সামলিয়ে রেখো।"

"আর আমার লোভ কে সামলাবে।"

"তোমার নাস্তিক ধর্ম।"

কিছুকাল দেখা নেই অভীকের। চিঠিপত্র কিছু পাওয়া যায় নি। বিভার মুখ শুকিয়ে গেছে। কোনো কাজ করতে মন যাচ্ছে না। তার ভাবনাগুলো গেছে ঘুলিয়ে। কী হয়েছে, কী হতে পারে, তার ঠিক পাচ্ছে না। দিনগুলো যাচ্ছে পাঁজর-ভেঙে-দেওয়া বোঝার মতন। ওর কেবলই মনে হচ্ছে, অভীক ওর উপরেই অভিমান করে চলে গেছে। ও ঘরছাড়া ছেলে, ওর বাঁধন নেই, উধাও হয়ে চলে গেল; ও হয়তো আর ফিরবে না। ওর মন কেবলই বলতে লাগল, 'রাগ কোরো না, ফিরে এসো, আমি তোমাকে আর দুঃখ দেব না।' অভীকের সমস্ত ছেলেমানুষি, ওর অবিবেচনা, ওর আবদার, যতই মনে পড়তে লাগল ততই জল পড়তে লাগল ওর দুই চক্ষু বেয়ে, কেবলই নিজেকে পাষাণী বলে ধিক্‌কার দিলে।

এমন সময়ে এল চিঠি স্টিমারের ছাপমারা। অভীক লিখেছে :

জাহাজের স্টোকার হয়ে চলেছি বিলেতে। এঞ্জিনে কয়লা জোগাতে হবে। বলছি বটে ভাবনা কোরো না, কিন্তু ভাবনা করছ মনে করে ভালো লাগে। তবু বলে রাখি এঞ্জিনের তাতে পোড়া আমার অভ্যেস আছে। জানি তুমি এই বলে রাগ করবে যে, কেন পাথেয় দাবি করি নি তোমার কাছ থেকে। একমাত্র কারণ এই যে, আমি যে আর্টিস্ট এ পরিচয়ে তোমার একটুও শ্রদ্ধা নেই। এ আমার চিরদুঃখের কথা ; কিন্তু এজন্যে তোমাকে দোষ দেব না। আমি নিশ্চয়ই জানি, একদিন সেই রসজ্ঞ দেশের গুণী লোকেরা আমাকে স্বীকার করে নেবে যাদের স্বীকৃতির খাঁটি মূল্য আছে।

অনেক মূঢ় আমার ছবির অন্যায় প্রশংসা করেছে। আবার অনেক মিথ্যুক করেছে ছলনা। তুমি আমার মন ভোলানোর জন্যে কোনোদিন কৃত্রিম স্তব কর নি। যদিও তোমার জানা ছিল, তোমার একটুখানি প্রশংসা আমার পক্ষে অমৃত। তোমার চরিত্রের অটল সত্য থেকে আমি অপরিমেয় দুঃখ পেয়েছি, তবু সেই সত্যকে দিয়েছি আমি বড়ো মূল্য। একদিন বিশ্বের কাছে যখন সম্মান পাব, তখন সবচেয়ে সত্য সম্মান আমাকে তুমিই দেবে—তার সঙ্গে হৃদয়ের সুধা মিশিয়ে। যতক্ষণ তোমার বিশ্বাস অসন্দিগ্ধ সত্যে না পৌঁছবে ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা করবে। এই কথা মনে রেখে আজ দুঃসাধ্য-সাধনার পথে চলেছি।

এতক্ষণে জানতে পেরেছ তোমার হারখানি গেছে চুরি। এ হার তুমি বাজারে বিক্রি করতে যাচ্ছ, এই ভাবনা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলুম না। তুমি পাঁজর ভেঙে সিঁধ কাটতে যাচ্ছিলে আমার বুকের মধ্যে। তোমার ঐ হারের বদলে আমার একতাড়া ছবি তোমার গয়নার বাক্সের কাছে রেখে এসেছি। মনে মনে হেসো না। বাংলাদেশের কোথাও এই ছবিগুলো ছেঁড়া কাগজের বেশি দর পাবে না। অপেক্ষা কোরো বী, আমার মধুকরী, তুমি ঠকবে না, কখনোই

না। হঠাৎ যেমন কোদালের মুখে গুপ্তধন বেরিয়ে পড়ে, আমি জাঁক করে বলছি, তেমনি আমার ছবিগুলির দুর্মূল্য দীপ্তি হঠাৎ বেরিয়ে পড়বে। তার আগে পর্যন্ত হেসো, কেননা সব মেয়ের কাছেই সব পুরুষ ছেলেমানুষ— যাদের তারা ভালোবাসে। তোমার সেই স্নিগ্ধ কৌতুকের হাসি আমার কল্পনায় ভরতি করে নিয়ে চললুম সমুদ্রের পারে। আর নিলুম তোমার সেই মধুময় ঘর থেকে একখানি মধুময় অপবাদ। দেখেছি তোমার ভগবানের কাছে তুমি কত দরবার নিয়ে প্রার্থনা কর, এবার থেকে এই প্রার্থনা কোরো, তোমার কাছ থেকে চলে আসার দারুণ দুঃখ যেন একদিন সার্থক হয়।

তুমি মনে মনে কখনো আমাকে ঈর্ষা করেছ কি না জানি নে। এ কথা সত্য, মেয়েদের আমি ভালোবাসি। ঠিক ততটা না হোক, মেয়েদের আমার ভালো লাগে। তারা আমাকে ভালোবেসেছে, সেই ভালোবাসা আমাকে কৃতজ্ঞ করে। কিন্তু নিশ্চয় তুমি জান যে, তারা নীহারিকামণ্ডলী, তার মাঝখানে তুমি একটিমাত্র ধ্রুবনক্ষত্র। তারা আভাস, তুমি সত্য। এ-সব কথা শোনাবে সেন্টিমেন্টাল। উপায় নেই, আমি কবি নই। আমার ভাষাটা কলার ভেলার মতো, ঢেউ লাগলেই বাড়াবাড়ি করে দোলা দিয়ে। জানি বেদনার যেখানে গভীরতা সেখানে গম্ভীর হওয়া চাই, নইলে সত্যের মর্যাদা থাকে না। দুর্বলতা চঞ্চল, অনেকবার আমার দুর্বলতা দেখে হেসেছ। এই চিঠিতে তারই লক্ষণ দেখে একটু হেসে তুমি বলবে, এই তো ঠিক তোমার অভীর মতোই ভাবখানা। কিন্তু এবার হয়তো তোমার মুখে হাসি আসবে না। তোমাকে পাই নি বলে অনেক খুঁতখুঁত করেছি, কিন্তু হৃদয়ের দানে তুমি যে কৃপণ, এ কথার মতো এতবড়ো অবিচার আর কিছু হতে পারে না। আসলে এ জীবনে তোমার কাছে আমার সম্পূর্ণ প্রকাশ হতে পারল না। হয়তো কখনো হতে পারবে না। এই তীব্র অতৃপ্তি আমাকে এমন কাঙাল করে রেখেছে। সেইজন্যেই আর-কিছু বিশ্বাস করি বা না করি, হয়তো জন্মান্তরে বিশ্বাস করতে

হবে। তুমি স্পষ্ট করে আমাকে তোমার ভালোবাসা জানাও নি কিন্তু তোমার স্তব্ধতার গভীর থেকে প্রতি ক্ষণে যা তুমি দান করেছ, এই নাস্তিক তাকে কোনো সংজ্ঞা দিতে পারে নি—বলেছে, অলৌকিক। এরই আকর্ষণে কোনো এক ভাবে হয়তো তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভগবানেরই কাছাকাছি ফিরেছি। ঠিক জানি নে। হয়তো সবই বানানো কথা। কিন্তু হৃদয়ের একটা গোপন জায়গা আছে আমাদের নিজেরই অগোচরে, সেখানে প্রবল ঘা লাগলে কথা আপনি বানিয়ে বানিয়ে ওঠে, হয়তো সে এমন কোনো সত্য যা এতদিনে নিজে জানতে পারি নি।

বী, আমার মধুকরী, জগতে সবচেয়ে ভালোবেসেছি তোমাকে। সেই ভালোবাসার কোনো একটা অসীম সত্যভূমিকা আছে বলে যদি মনে করা যায়, আর তাকেই যদি বল তোমাদের ঈশ্বর, তা হলে তাঁর দুয়ার আর তোমার দুয়ার এক হয়ে রইল এই নাস্তিকের জন্যে। আবার আমি ফিরব—তখন আমার মত, আমার বিশ্বাস, সমস্ত চোখ বুজে সমর্পণ করে দেব তোমার হাতে; তুমি তাকে পৌঁছিয়ে দিয়ো তোমার তীর্থপথের শেষ ঠিকানায়, যাতে বুদ্ধির বাধা নিয়ে তোমার সঙ্গে এক মুহূর্তের বিচ্ছেদ আর কখনো না ঘটে। তোমার কাছ থেকে আজ দূরে এসে ভালোবাসার অভাবনীয়তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আমার মনের মধ্যে, যুক্তিতর্কের কাঁটার বেড়া পার করিয়ে দিয়েছে আমাকে—আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাকে লোকাতীত মহিমায়। এতদিন বুঝতে চেয়েছিলুম বুদ্ধি দিয়ে, এবার পেতে চাই আমার সমস্তকে দিয়ে।

তোমার নাস্তিক ভক্ত

অভীক

শেষ কথা

জীবনের প্রবহমান ঘোলা রঙের হ-য-ব-র-ল'র মধ্যে হঠাৎ যেখানে গল্পটা আপন রূপ ধ'রে সদ্য দেখা দেয়, তার অনেক পূর্ব থেকেই নায়ক-নায়িকারা আপন পরিচয়ের সূত্র গেঁথে আসে। পিছন থেকে সেই প্রাক্‌গাল্পিক ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতেই হয়। তাই কিছু সময় নেব, আমি যে কে সেই কথাটাকে পরিষ্কার করবার জন্যে। কিন্তু নাম ধাম ভাঁড়াতে হবে। নইলে জানাশোনা মহলের জবাবদিহি সামলাতে পারব না। কী নাম নেব তাই ভাবছি, রোম্যান্টিক নামকরণের দ্বারা গোড়া থেকেই গল্পটাকে বসন্তরাগে পঞ্চমস্বরে বাঁধতে চাই নে। নবীনমাধব নামটা বোধ হয় চলে যেতে পারবে, ওর বাস্তবের শ্যাম্‌লা রঙটা ধুয়ে ফেলে করা যেতে পারত নবারুণ সেনগুপ্ত; কিন্তু তা হলে খাঁটি শোনাত না, গল্পটা নামের বড়াই করে লোকের বিশ্বাস হারাত, লোকে মনে করত ধার-করা জামিয়ার পরে সাহিত্যসভায় বাবুয়ানা করতে এসেছে।

আমি বাংলাদেশের বিপ্লবীদলের একজন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহাকর্ষ-শক্তি আণ্ডামান-তীরের খুব কাছাকাছি টান মেরেছিল। নানা বাঁকা পথে সি. আই. ডি.-র ফাঁস এড়িয়ে এড়িয়ে গিয়েছিলুম আফগানিস্থান পর্যন্ত। অবশেষে পৌঁচেছি আমেরিকায় খালাসীর কাজ নিয়ে। পূর্ববঙ্গীয় জেদ ছিল মজ্জায়, একদিনও ভুলি নি যে, ভারতবর্ষের হাতপায়ের শিকলে উখো ঘষতে হবে দিনরাত যতদিন বেঁচে থাকি। কিন্তু বিদেশে কিছুদিন থাকতেই একটা কথা নিশ্চিত বুঝেছিলুম, আমরা যে প্রণালীতে বিপ্লবের পালা শুরু করেছিলুম, সে যেন আতশবাজিতে পটকা ছোঁড়ার মতো, তাতে নিজের পোড়াকপাল পুড়িয়েছি অনেক বার, দাগ পড়ে নি ব্রিটিশ রাজতক্তে। আগুনের উপর পতঙ্গের অন্ধ আসক্তি। যখন সদর্পে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলুম তখন বুঝতে পারি নি, সেটাতে ইতিহাসের যজ্ঞানল

জ্বালানো হচ্ছে না, জ্বালাচ্ছি নিজেদের খুব ছোটো ছোটো চিতানল। ইতিমধ্যে য়ুরোপীয় মহাসমরের ভীষণ প্রলয়রূপ তার অতি বিপুল আয়োজন সমেত চোখের সামনে দেখা দিয়েছিল— এই যুগান্তরসাধিনী সর্বনাশাকে আমাদের খোড়োঘরের চণ্ডী-মণ্ডপে প্রতিষ্ঠা করতে পারব সে দুরাশা মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেল; সমারোহ করে আত্মহত্যা করবার মতোও আয়োজন ঘরে নেই। তখন ঠিক করলুম, ন্যাশনাল দুর্গের গোড়া পাকা করতে হবে। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলুম, বাঁচতে যদি চাই আদিম যুগের হাত-দুখানায় যে-ক'টা নখ আছে তা দিয়ে লড়াই করা চলবে না। এ যুগে যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের দিতে হবে পাল্লা; যেমন-তেমন করে মরা সহজ, কিন্তু বিশ্বকর্মার চেলাগিরি করা সহজ নয়। অধীর হয়ে ফল নেই, গোড়া থেকেই কাজ শুরু করতে হবে— পথ দীর্ঘ, সাধনা কঠিন।

দীক্ষা নিলুম যন্ত্রবিদ্যায়। ডেট্রয়েটে ফোর্ডের মোটর-কারখানায় কোনোমতে ঢুকে পড়লুম। হাত পাকাচ্ছিলুম, কিন্তু মনে হচ্ছিল না খুব বেশি দূর এগোচ্ছি। একদিন কী দুর্বুদ্ধি ঘটল, মনে হল, ফোর্ডকে যদি একটুখানি আভাস দিই যে, আমার উদ্দেশ্য নিজের উন্নতি করা নয়, দেশকে বাঁচানো, তা হলে স্বাধীনতাপূজারী আমেরিকার ধন-সৃষ্টির জাদুকর বুঝি খুশি হবে, এমন-কি আমার রাস্তা হয়তো করে দেবে প্রশস্ত। ফোর্ড চাপা হাসি হেসে বললে, 'আমার নাম হেন্‌রি ফোর্ড, পুরাতন ইংরেজি নাম। আমাদের ইংলণ্ডের মামাতো ভাইরা অকেজো, তাদের আমি কেজো করব— এই আমার সংকল্প।' আমি ভেবেছিলুম, ভারতীয়কেও কেজো করে তুলতে উৎসাহ হতেও পারে। একটা কথা বুঝতে পারলুম, টাকাওয়ালার দরদ টাকাওয়ালাদেরই 'পরে। আর দেখলুম, এখানে চাকাতৈরির চক্রপথে শেখা বেশি দূর এগোবে না। এই উপলক্ষে একটা বিষয়ে চোখ খুলে গেল, সে হচ্ছে এই যে, যন্ত্রবিদ্যাশিক্ষার আরো গোড়ায় যাওয়া চাই, যন্ত্রের মাল-

মসলা-সংগ্রহ শিখতে হবে। ধরণী শক্তিমানদের জন্যে জমা করে রেখেছেন তার দুর্গম জঠরে কঠিন খনিজ পদার্থ, এই নিয়ে দিগ্বিজয় করেছে তারা, আর গরিবদের জন্যে রয়েছে তার উপরের স্তরে ফসল— হাড় বেরিয়েছে তাদের পাঁজরায়, চুপসে গেছে তাদের পেট। আমি লেগে গেলুম খনিজবিদ্যা শিখতে। ফোর্ড বলেছে ইংরেজ অকেজো, তার প্রমাণ হয়েছে ভারতবর্ষে— একদিন হাত লাগিয়েছিল তারা নীলের চাষে, আর-একদিন চায়ের চাষে— সিবিলিয়ানের দল দপ্তরখানায় তকমাপরা law and order-এর ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু ভারতের বিশাল অন্তর্ভাণ্ডারের সম্পদ উদ্‌ঘাটিত করতে পারে নি, কি মানবচিত্তের, কি প্রকৃতির। বসে বসে পাটের চাষীর রক্ত নিংড়েছে। জাম্‌শেদ্ টাটাকে সেলাম করেছি সমুদ্রের ওপার থেকে। ঠিক করেছি আমার কাজ পটকা ছোঁড়া নয়। সিঁধ কাটতে যাব পাতালপুরীর পাথরের প্রাচীরে। মায়ের আঁচলধরা বুড়ো খোকাদের দলে মিশে 'মা মা' ধ্বনিতে মন্তর পড়ব না, আর দেশের দরিদ্রকে অক্ষম অভুক্ত অশিক্ষিত দরিদ্র বলেই মানব, 'দরিদ্রনারায়ণ' বুলি দিয়ে তার নামে মন্তর বানাব না। প্রথম বয়সে এরকম বচনের পুতুলগড়া খেলা অনেক খেলেছি— কবিদের কুমোরবাড়িতে স্বদেশের যে রাংতালাগানো প্রতিমা গড়া হয়, তারই সামনে বসে বসে অনেক চোখের জল ফেলেছি। কিন্তু আর নয়, এই জাগ্রত বুদ্ধির দেশে এসে বাস্তবকে বাস্তব বলে জেনেই শুকনো চোখে কোমর বেঁধে কাজ করতে শিখেছি। এবার গিয়ে বেরিয়ে পড়বে এই বিজ্ঞানী বাঙাল কোদাল নিয়ে কুড়ুল নিয়ে হাতুড়ি নিয়ে দেশের গুপ্তধনের তল্লাসে, এই কাজটাকে কবির গদ্‌গদ-কণ্ঠের চেলারা দেশমাতৃকার পূজা বলে চিনতেই পারবে না।

ফোর্ডের কারখানাঘর ছেড়ে তার পরে ন বছর কাটিয়েছি খনি-বিদ্যা খনিজবিদ্যা শিখতে। য়ুরোপের নানা কেন্দ্রে ঘুরেছি, হাতে-

কলমে কাজ করেছি, দুই-একটা যন্ত্রকৌশল নিজেও বানিয়েছি, তাতে উৎসাহ পেয়েছি অধ্যাপকদের কাছে, নিজের উপরে বিশ্বাস হয়েছে, ধিক্‌কার দিয়েছি ভূতপূর্ব মন্ত্রমুগ্ধ অকৃতার্থ নিজেকে।

আমার ছোটোগল্পের সঙ্গে এই-সব বড়ো বড়ো কথার একান্ত যোগ নেই— বাদ দিলে চলত, হয়তো ভালোই হত। কিন্তু এই উপলক্ষে একটা কথা বলার দরকার ছিল, সেটা বলি। যৌবনের গোড়ার দিকে নারীপ্রভাবের ম্যাগ্‌নেটিজ্‌মে জীবনের মেরু-প্রদেশের আকাশে যখন অরোরার রঙিন ছটার আন্দোলন ঘটতে থাকে, তখন আমি ছিলুম অন্যমনস্ক, একেবারে কোমর বেঁধে অন্য-মনস্ক। আমি সন্ন্যাসী, আমি কর্মযোগী— এই-সব বাণীর দ্বারা মনের আগল শক্ত করে আঁটা ছিল। কন্যাদায়িকরা যখন আশেপাশে আনাগোনা করেছিল, আমি স্পষ্ট করেই বলেছি, কন্যার কুষ্ঠিতে যদি অকালবৈধব্যযোগ থাকে, তবেই যেন কন্যার পিতা আমার কথা চিন্তা করেন।

পাশ্চাত্য মহাদেশে নারীসঙ্গ ঠেকাবার বেড়া নেই। সেখানে আমার পক্ষে দুর্যোগের বিশেষ আশঙ্কা ছিল। আমি যে সুপুরুষ, দেশে থাকতে নারীদের মুখে সে কথা চোখের মৌন ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় শোনবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তাই এ তথ্যটা আমার চেতনার বাইরে পড়ে ছিল। বিলেতে গিয়ে যেমন আবিষ্কার করেছি সাধারণের তুলনায় আমার বুদ্ধি বেশি আছে, তেমনি ধরা পড়েছিল আমাকে দেখতে ভালো। আমার এদেশী পাঠকদের মনে ঈর্ষা জন্মাবার মতো অনেক কাহিনীর ভূমিকা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু হলফ করে বলছি, আমি তাদের নিয়ে ভাবের কুহকে মনকে জমাট বাঁধতে দিই নি। হয়তো আমার স্বভাবটা কড়া, পশ্চিমবঙ্গের শৌখিনদের মতো ভাবালুতায় আর্দ্রচিত্ত নই; নিজেকে পাথরের সিন্ধুক করে তার মধ্যে আমার সংকল্পকে ধরে রেখেছিলুম। মেয়েদের নিয়ে রসের পালা শুরু করে তার পরে সময় বুঝে খেলা ভঙ্গ করা,

সেও ছিল আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ; আমি নিশ্চয় জানতুম, যে-জেদ নিয়ে আমি আমার ব্রতের আশ্রয়ে বেঁচে আছি, এক-পা ফসকালে সেই জেদ নিয়েই আমার ভাঙা ব্রতের তলায় পিষে মরতে হবে। আমার পক্ষে এর মাঝখানে কোনো ফাঁকির পথ নেই। তা ছাড়া আমি জন্মপাড়াগেঁয়ে, মেয়েদের সম্বন্ধে আমার সেকেলে সংকোচ ঘুচতে চায় না। তাই মেয়েদের ভালোবাসা নিয়ে যারা অহংকারের বিষয় করে, আমি তাদের অবজ্ঞা করি।

বিদেশী ভালো ডিগ্রিই পেয়েছিলুম। সেটা এখানে সরকারী কাজে লাগবে না জেনে ছোটনাগপুরে চন্দ্রবংশীয় এক রাজার— মনে করা যাক, চণ্ডবীর সিংহের দরবারে কাজ নিয়েছিলুম। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর ছেলে দেবিকাপ্রসাদ কিছুদিন কেম্‌ব্রিজে পড়াশুনো করেছিলেন। দৈবাৎ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল জুরিকে, সেখানে আমার খ্যাতি তাঁর কানে গিয়েছিল। তাঁকে বুঝিয়েছিলুম আমার প্ল্যান। শুনে খুব উৎসাহিত হয়ে তাঁদের স্টেটে আমাকে জিয়লজিকাল সর্ভের কাজে লাগিয়ে দিলেন। এমন কাজ ইংরেজকে না দেওয়াতে উপরিস্তরের বায়ুমণ্ডল বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু দেবিকাপ্রসাদ ছিলেন ঝাঁঝালো লোক। বুড়ো রাজার মন টলমল করা সত্ত্বেও টিঁকে গেলুম।

এখানে আসবার আগে মা আমাকে বললেন, 'বাবা, ভালো কাজ পেয়েছ, এইবার একটি বিয়ে করো, আমার অনেক দিনের সাধ মিটুক।' আমি বললুম, 'অর্থাৎ কাজ মাটি করো। আমার যে-কাজ তার সঙ্গে বিয়ের তাল মিলবে না।' দৃঢ় সংকল্প, ব্যর্থ হল মায়ের অনুনয়। যন্ত্রতন্ত্র সমস্ত বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে চলে এলুম জঙ্গলে।

এইবার আমার দেশব্যাপী কীর্তিসম্ভাবনার ভাবী দিগন্তে হঠাৎ যে একটুকু গল্প ফুটে উঠল তাতে আলেয়ার চেহারাও আছে, আরো আছে শুকতারার। নীচের পাথরকে প্রশ্ন করে মাটির সন্ধানে বেড়াচ্ছিলুম বনে বনে। পলাশফুলের রাঙা রঙের মাৎলামিতে তখন

বিভোর আকাশ। শালগাছে ধরেছে মঞ্জরি, মৌমাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। ব্যাবসাদাররা জৌ সংগ্রহে লেগে গিয়েছে। কুলের পাতা থেকে জমা করছে তসরের রেশমের গুটি। সাঁওতালরা কুড়োচ্ছে পাকা মহুয়া-ফল। ঝিরঝির শব্দে হালকা নাচের ওড়না ঘুরিয়ে চলেছিল একটি ছিপছিপে নদী, আমি তার নাম দিয়েছিলুম—তনিকা। এটা কারখানাঘর নয়, কলেজক্লাস নয়, এ সেই সুখতন্দ্রায় আবিল প্রদোষের রাজ্য যেখানে একলা মন পেলে প্রকৃতি মায়াবিনী তার উপরেও রঙরেজিনীর কাজ করে—যেমন সে করে সূর্যাস্তের পটে।

মনটাতে একটু আবেশের ঘোর লেগেছিল। মন্থর হয়ে এসেছিল কাজের চাল, নিজের উপরে বিরক্ত হয়েছিলুম, ভিতর থেকে জোর লাগাচ্ছিলুম দাঁড়ে। মনে ভাবছিলুম, ট্রপিকাল আবহাওয়ার মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়লুম বুঝি। শয়তানি ট্রপিক্‌স্‌ এ দেশে জন্মকাল থেকে হাতপাখার হাওয়ায় হারের মন্ত্র চালাচ্ছে আমাদের রক্তে—এড়াতে হবে তার স্বেদসিক্ত জাদু।

বেলা পড়ে এল। এক জায়গায় মাঝখানে চর ফেলে দুভাগে চলে গিয়েছে নদী। সেই বালুর দ্বীপে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে বকের দল। দিনাবসানে রোজ এই দৃশ্যটি ইঙ্গিত করত আমার কাজের বাঁক ফিরিয়ে দিতে, ঝুলিতে মাটি-পাথরের নমুনা নিয়ে ফিরে চলছিলুম আমার বাংলো-ঘরে, সেখানে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করতে যাব। অপরাহ্ণ আর সন্ধ্যার মাঝখানে দিনের যে একটা পোড়ো জমির মতো ফালতো অংশ আছে, একলা মানুষের পক্ষে সেইটে কাটিয়ে চলা শক্ত। বিশেষত নির্জন বনে। তাই আমি ওই সময়টা রেখেছি পরখ করার কাজে। ডাইনামোতে বিজলি বাতি জ্বালাই, কেমিক্যাল নিয়ে মাইক্রস্‌কোপ নিয়ে নিক্তি নিয়ে বসি। এক-একদিন রাত দুপুর পেরিয়ে যায়। আজ আমার সন্ধানে এক জায়গায় ম্যাঙ্গানিজের লক্ষণ যেন ধরা পড়েছিল। তাই দ্রুত

উৎসাহে চলেছিলুম। কাকগুলো মাথার উপর দিয়ে গেরুয়ারঙের আকাশে কা কা শব্দে চলেছিল বাসায়।

এমন সময় হঠাৎ বাধা পড়ল আমার কাজে ফেরায়। পাঁচটি শালগাছের ব্যূহ ছিল বনের পথে একটা টিবির উপরে। সেই বেষ্টনীর মধ্যে কেউ বসে থাকলে কেবল একটিমাত্র ফাঁকের মধ্যে দিয়ে তাকে দেখা যায়, হঠাৎ চোখ এড়িয়ে যাবারই কথা। সেদিন মেঘের মধ্যে আশ্চর্য একটা দীপ্তি ফেটে পড়েছিল। বনের সেই ফাঁকটাতে ছায়ার ভিতরে রাঙা আলো যেন দিগঙ্গনার গাঁঠছেঁড়া সোনার মুঠোর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক সেই আলোর পথে বসে আছে মেয়েটি, গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে পা-ছুটি বুকের কাছে গুটিয়ে একমনে লিখছে একটি ডায়ারির খাতা নিয়ে। এক মুহূর্তে আমার কাছে প্রকাশ পেল একটি অপূর্ব বিস্ময়। জীবনে এরকম দৈবাৎ ঘটে। পূর্ণিমার বান ডেকে আসার মতো বক্ষতটে ধাক্কা দিতে লাগল জোয়ারের ঢেউ।

গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলুম। একটি আশ্চর্য ছবি চিহ্নিত হতে লাগল মনের চিরস্মরণীয়াগারে। আমার বিস্তৃত অভিজ্ঞতার পথে অনেক অপ্রত্যাশিত মনোহরের দরজায় ঠেকেছে মন, পাশ কাটিয়ে চলে গেছি, আজ মনে হল জীবনের একটা কোন্ চরমের সংস্পর্শে এসে পৌঁছলুম। এমন করে ভাবা, এমন করে বলা আমার একেবারে অভ্যস্ত নয়। যে-আঘাতে মানুষের নিজের অজানা একটা অপূর্ব স্বরূপ ছিটকিনি খুলে অবারিত হয়, সেই আঘাত আমাকে লাগল কী করে। বরাবর জানি, আমি পাহাড়ের মতো খটখটে, নিরেট। ভিতর থেকে উছলে পড়ল ঝরনা।

একটা-কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু মানুষের সঙ্গে সবচেয়ে বড়ো আলাপের প্রথম কথাটি কী হতে পারে ভেবে পাই নে। সে হচ্ছে খৃস্টীয় পুরাণের প্রথম সৃষ্টির বাণী, আলো জাগুক, অব্যক্ত হয়ে যাক ব্যক্ত। একসময়ে মনে হল—মেয়েটি—ওর আসল নাম পরে

জেনেছি কিন্তু সেটা ব্যবহার করব না, ওকে নাম দিলুম অচিরা। মানে কী। মানে এই, যার প্রকাশ হতে বিলম্ব হল না, বিদ্যুতের মতো। রইল ঐ নাম।— মুখ দেখে মনে হল অচিরা জানতে পেরেছে, কে-একজন আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। উপস্থিতির একটা নীরব ধ্বনি আছে বুঝি। লেখা বন্ধ করেছে, অথচ উঠতে পারছে না। পলায়নটা পাছে বড্ড বেশি স্পষ্ট হয়। একবার ভাবলুম বলি, 'মাপ করুন', কী মাপ করা, কী অপরাধ, কী বলব তাকে। একটু তফাতে গিয়ে বিলিতি বেঁটে কোদাল নিয়ে মাটিতে খোঁচা মারবার ভান করলুম, ঝুলিতে একটা কী পুরলুম, সেটা অত্যন্ত বাজে। তার পরে ঝুঁকে প'ড়ে মাটিতে বিজ্ঞানী দৃষ্টি চালনা করতে করতে চলে গেলুম। কিন্তু নিশ্চয় মনে জানি, যাঁকে ভোলাবার চেষ্টা করেছিলুম তিনি ভোলেন নি। মুগ্ধ পুরুষচিত্তের দুর্বলতার আরো অনেক প্রমাণ তিনি আরো অনেকবার পেয়েছেন, সন্দেহ নেই। আশা করলুম আমার বেলায় এটা তিনি মনে মনে উপভোগ করেছেন। এর চেয়ে বেড়া আর অল্প একটু যদি ডিঙোতুম, তা হলে—তা হলে কী হত কী জানি। রাগতেন, না রাগের ভান করতেন? অত্যন্ত চঞ্চল মন নিয়ে চলেছি আমার বাংলো-ঘরের পথে, এমন সময় আমার চোখে পড়ল দুই টুকরায় ছিন্নকরা একখানা চিঠির খাম। এটাকে জিয়লজিকাল নমুনা বলে না। তবু তুলে দেখলুম। নামটা ভবতোষ মজুমদার আই. সি. এস. ; ঠিকানা ছাপরা, মেয়েলি হাতে লেখা। টিকিট লাগানো আছে, তাতে ডাকঘরের ছাপ নেই। যেন কুমারীর দ্বিধা। আমার বিজ্ঞানী বুদ্ধি ; স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, এই ছেঁড়া চিঠির খামের মধ্যে একটা ট্র্যাজেডির ক্ষতচিহ্ন আছে। পৃথিবীর ছেঁড়া স্তর থেকে তার বিপ্লবের ইতিহাস বের করা আমাদের কাজ। সেই আমার সন্ধানপটু হাত এই ছেঁড়া খামের রহস্য আবিষ্কার করতে সংকল্প করলে।

ইতিমধ্যে ভাবছি, নিজের অন্তঃকরণের রহস্য অভূতপূর্ব। এক-একটা বিশেষ অবস্থার সংস্পর্শে তার ভাবখানা কী যে একটা নতুন

আকারে দানা বেঁধে দেখা দেয়, এবারে তার পরিচয়ে বিস্মিত হয়েছি। এতদিন যে-মনটা নানা কঠিন অধ্যবসায় নিয়ে শহরে শহরে জীবনের লক্ষ্য সন্ধানে ঘুরেছে, তাকে স্পষ্ট করে চিনেছিলুম। ভেবেছিলুম সেই আমার সত্যকার স্বভাব, তার আচরণের ধ্রুবত্ব সম্বন্ধে আমি হলপ করতে পারতুম। কিন্তু তার মধ্যে বুদ্ধিশাসনের বহির্ভূত যে একটা মূঢ় লুকিয়ে ছিল, তাকে এই প্রথম দেখা গেল। ধরা পড়ে গেল আরণ্যক, যে যুক্তি মানে না, যে মোহ মানে। বনের একটা মায়া আছে, গাছপালার নিঃশব্দ চক্রান্ত, আদিম প্রাণের মন্ত্রধ্বনি। দিনে দুপুরে ঝাঁ-ঝাঁ করে তার উদাত্ত সুর, রাতে দুপুরে মন্দ্রগম্ভীর ধ্বনি, গুঞ্জন করতে থাকে জীবচেতনায়, আদিম প্রাণের গূঢ় প্রেরণায় বুদ্ধিকে দেয় আবিষ্ট করে।

জিয়লজির চর্চার মধ্যেই ভিতরে ভিতরে এই আরণ্যক মায়ার কাজ চলছিল, খুঁজছিলুম রেডিয়মের কণা, যদি কৃপণ পাথরের মুঠির মধ্য থেকে বের করা যায়; দেখতে পেলুম অচিরাকে, কুসুমিত শাল-গাছের ছায়ালোকের বন্ধনে। এর পূর্বে বাঙালি মেয়েকে দেখেছি সন্দেহ নেই। কিন্তু সব-কিছু থেকে স্বতন্ত্রভাবে এমন একান্ত করে তাকে দেখবার সুযোগ পাই নি। এখানে তার শ্যামল দেহের কোমলতায় বনের লতাপাতা আপন ভাষা যোগ করে দিল। বিদেশিনী রূপসী তো অনেক দেখেছি, যথোচিত ভালোও লেগেছে। কিন্তু বাঙালি মেয়ে এই যেন প্রথম দেখলুম ঠিক যে-জায়গায় তাকে সম্পূর্ণ দেখা যেতে পারে, এই নিভৃত বনের মধ্যে সে নানা পরিচিত অপরিচিত বাস্তবের সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে নেই; দেখে মনে হয় না, সে বেণী দুলিয়ে ডায়োসিশনে পড়তে যায়, কিংবা বেথুন কলেজের ডিগ্রিধারিণী, কিংবা বালিগঞ্জের টেনিস পার্টিতে উচ্চ কলহাস্যে চা পরিবেশন করে। অনেক দিন আগে ছেলেবেলায় হরু ঠাকুর কিংবা রাম বসুর যে গান শুনে তার পরে ভুলে গিয়েছিলুম, যে-গান আজ রেডিয়োতে বাজে না, গ্রামোফোনে

পাড়া মুখরিত করে না, জানি নে কেন মনে হল সেই গানের সহজ রাগিণীতে ঐ বাঙালি মেয়েটির রূপের ভূমিকা—মনে রইল, সই, মনের বেদনা। এই গানের সুরে যে একটি করুণ ছবি আছে, সে আজ রূপ নিয়ে আমার চোখে স্পষ্ট ফুটে উঠল। এও সম্ভব হল। কোন্ প্রবল ভূমিকম্পে পৃথিবীর যে তলায় লুকোনো আগ্নেয় সামগ্রী উপরে উঠে পড়ে, জিয়লজি শাস্ত্রে তা পড়েছি, নিজের মধ্যে দেখলুম সেই নীচের তলার অন্ধকারের তপ্তবিগলিত জিনিসকে হঠাৎ উপরের আলোতে। কঠোর বিজ্ঞানী নবীনমাধবের অটল অন্তঃস্তরে এই উলটপালট আমি কোনোদিন আশা করতে পারি নি।

বুঝতে পারছি, যখন আমি রোজ বিকেলবেলায় এই পথ দিয়ে আমার কাজে ফিরেছি, ও আমাকে দেখেছে, অন্যমনস্ক আমি ওকে দেখি নি। বিলেতে যাবার পর থেকে নিজের চেহারার উপর একটা গর্ব জন্মেছে। ও হাউ হ্যাণ্ডসম—এই প্রশস্তি কানাকানিতে আমার অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিলেতফেরত আমার কোনো কোনো বন্ধুর কাছে শুনেছি, বাঙালি মেয়ের রুচি আলাদা, তারা মোলায়েম মেয়েলি রূপই পুরুষের রূপে খোঁজে। চলিত কথা হচ্ছে—কার্তিকের মতো চেহারা। বাঙালি কার্তিক আর যাই হোক, কোনো পুরুষে দেবসেনাপতি নয়। প্যারিসে একজন বান্ধবীর মুখে শুনেছি, বিলিতি সাদারঙ রঙের অভাব; ওরিয়েণ্টালের দেহে গরম আকাশ যে রঙ এঁকে দেয় সে সত্যিকার রঙ, সে ছায়ার রঙ, ঐ রঙই আমাদের ভালো লাগে; এ কথাটা বঙ্গোপসাগরের ধারে বোধ হয় খাটে না। এতদিন এ-সব আলোচনা আমার মনেই ওঠে নি। কয়েকদিন ধ'রে আমাকে ভাবিয়েছে। রোদে-পোড়া আমার রঙ, লম্বা আমার প্রাণসার দেহ, শক্ত আমার বাহু, দ্রুত আমার গতি, শুনেছি দৃষ্টি আমার তীক্ষ্ণ, নাক চিবুক কপাল নিয়ে সুস্পষ্ট জোরালো আমার চেহারা। এপ্‌স্টাইন পাথরে আমার মূর্তি গড়তে চেয়েছিল, সময় দিতে পারি নি। কিন্তু বাঙালিকে আমি মায়ের খোকা বলেই

জানি, আর মায়েরা তাদের কোলের ধনকে মোমে-গড়া পুতুলের মতো দেখতেই ভালোবাসে। এ-সব কথা মনের মধ্যে ঘুলিয়ে উঠে আমাকে রাগিয়ে তুলছিল। আগেভাগেই কল্পনায় ঝগড়া করছিলুম অচিরার সঙ্গে; বলছিলুম, 'তুমি যাকে বলো সুন্দর সে বিসর্জনের দেবতা, তোমাদের স্তব যদি বা পায় সে—টেঁকে না বেশিদিন।' বলছিলুম, 'আমি বড়ো বড়ো দেশের স্বয়ম্বরসভার মালা উপেক্ষা করে এসেছি, আর তুমি আমাকে উপেক্ষা করবে?' গায়ে প'ড়ে এই বানানো ঝগড়া এমনি ছেলেমানুষি যে, একদিন হেসে উঠেছি আপন উষ্মায়। এদিকে বিজ্ঞানীর যুক্তি কাজ করছে ভিতরে ভিতরে। মনকে জানাই, এটাও একটা মস্ত কথা, আমার যাতায়াতের পথের ধারে ও বসে থাকে—একান্ত নিভৃতই যদি ওর প্রার্থনীয় হত, তা হলে ঠাঁই বদল করত। প্রথম প্রথম আমি ওকে আড়ে আড়ে দেখেছি, যেন দেখি নি এই ভান করে। ইদানীং মাঝে মাঝে স্পষ্ট চোখোচোখি, হয়েছে—যতদূর আমার বিশ্বাস, সেটাকে চার চোখের অপঘাত বলে ওর মনে হয় নি।

এর চেয়েও বিশেষ একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। এর আগে দিনের বেলায় মাটি-পাথরের কাজ সাঙ্গ করে দিনের শেষে ঐ পঞ্চবটীর পথ দিয়ে একবারমাত্র যেতেম বাসার দিকে। সম্প্রতি যাতায়াতের পুনরাবৃত্তি হতে আরম্ভ হয়েছে। এই ঘটনাটা যে জিয়লজি সম্পর্কিত নয়, সে কথা বোঝবার মতো বয়স হয়েছে অচিরার, আমারও সাহস ক্রমশ বেড়ে চলল যখন দেখলুম, এই সুস্পষ্ট ভাবের আভাসেও তরুণীকে স্থানচ্যুত করতে পারল না। এক-একদিন হঠাৎ পিছন ফিরে দেখেছি, অচিরা আমার তিরোগমনের দিকে চেয়ে আছে, আমি ফিরতেই তাড়াতাড়ি ডায়ারির দিকে চোখ নামিয়ে নিয়েছে। সন্দেহ হল, ওর ডায়ারি লেখার ধারায় অগেকার মতো বেগ নেই। আমার বিজ্ঞানী বুদ্ধিতে মনোরহস্যের আলোচনা জেগে উঠল। বুঝেছি সে কোনো-এক পুরুষের জন্যে তপস্যার ব্রত নিয়েছে,

তার নাম ভবতোষ, সে ছাপরায় অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটি করছে বিলেত থেকে ফিরে এসেই। তার পূর্বে দেশে থাকতে এদের দুজনের প্রণয় ছিল গভীর, কাজ নেবার মুখেই একটা আকস্মিক বিপ্লব ঘটেছে। ব্যাপারটা কী, খবর নিতে হবে। শক্ত হল না, কেননা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কেম্ব্রিজের সতীর্থ আছে বঙ্কিম।

ডাকে চিঠি লিখে পাঠালুম, 'বেহার সিভিল সার্ভিসে আছে ভবতোষ। কন্যাকর্তাদের মহলে জনশ্রুতি শোনা যায়, লোকটি সৎ-পাত্র। আমার কোন বন্ধু আমাকে তাঁর মেয়ের জন্যে ঐ লোকটিকে প্রজাপতির ফাঁদে ফেলতে সাহায্য করতে অনুরোধ করেছেন। রাস্তা পরিষ্কার আছে কি না, আদ্যন্ত খবর নিয়ে তুমি যদি আমাকে জানাও কৃতজ্ঞ হব। লোকটির মতিগতি কী রকম তাও জানতে চাই।'

উত্তর এল, 'রাস্তা বন্ধ। আর মতিগতি সম্বন্ধে এখনো যদি কৌতূহল বাকি থাকে, তবে শোনো।—

'কলেজে পড়বার সময় আমি ছাত্র ছিলুম ডাক্তার অনিলকুমার সরকারের— অ্যাল্‌ফাবেটের অনেকগুলি অক্ষর জোড়া তাঁর নাম। যেমন তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, তেমনি ছেলেমানুষের মতো তাঁর সরলতা। একমাত্র সংসারের আলো তাঁর নাতিনীটিকে যদি দেখো, তা হলে মনে হবে সাধনায় খুশি হয়ে সরস্বতী কেবল যে অবির্ভূত হয়েছেন তাঁর বুদ্ধিলোকে তা নয়, রূপ নিয়ে এসেছেন তাঁর কোলে। ঐ শয়তান ভবতোষ ঢুকল ওঁর স্বর্গলোকে। বুদ্ধি তার তীক্ষ্ণ, বচন তার অনর্গল। প্রথমে ভুললেন অধ্যাপক, তার পরে ভুলল তাঁর নাতনী। ওদের অসহ্য অন্তরঙ্গতা দেখে আমাদের হাত নিসপিস করত। কিছু বলবার পথ ছিল না, বিবাহসম্বন্ধ পাকাপাকি স্থির হয়ে গিয়েছিল, কেবল অপেক্ষা ছিল বিলেত গিয়ে সিভিল সার্ভিসে উত্তীর্ণ হয়ে আসার। তার পাথেয় আর খরচ জুগিয়েছেন অধ্যাপক। লোকটার সর্দির ধাত ছিল। বধির ভগবানের কাছে আমরা দুবেলা প্রার্থনা করেছি, বিবাহের পূর্বে লোকটা যেন ন্যুমোনিয়া হয়ে মরে।

কিন্তু মরে নি। পাস করেছে। করেই ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্টের উচ্চপদস্থ একজন মুরুব্বির মেয়েকে বিয়ে করেছে। লজ্জায় ক্ষোভে নিজের কাজ ছেড়ে দিয়ে মর্মাহত মেয়েটিকে নিয়ে অধ্যাপক কোথায় যে অন্তর্ধান করেছেন, তার খবর রেখে যান নি।'

চিঠিখানা পড়লুম। দৃঢ় সংকল্প করলুম, এই মেয়েটিকে তার লজ্জা থেকে অবসাদ থেকে উদ্ধার করব।

ইতিমধ্যে অচিরার সঙ্গে কোনোরকম করে একটা কথা আরম্ভ করবার জন্যে মন ছটফট করতে লাগল। যদি বিজ্ঞানী না হয়ে হতুম সাহিত্যরসিক, কিংবা বাঙাল না হয়ে যদি হতুম পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক, তা হলে নিশ্চয় মুখে কথা বাধত না। কিন্তু বাঙালি মেয়েকে ভয় করি, চিনি নে বলে বোধ হয়। একটা ধারণা ছিল, হিন্দুনারী অজানা পরপুরুষমাত্রের কাছে একান্তই অনধিগম্য। খামকা কথা কইতে যাই যদি, তা হলে ওর রক্তে লাগবে অশুচিতা। সংস্কার জিনিসটা এমনি অন্ধ। এখানে কাজে যোগ দেবার পূর্বে কিছুদিন তো কলকাতায় কাটিয়ে এসেছি—আত্মীয়-বন্ধুমহলে দেখে এলুম সিনেমামঞ্চ-পথবর্তিনী রঙমাখানো বাঙালি মেয়ে, যারা জাতবান্ধবী, তাদের— থাক্ তাদের কথা। কিন্তু অচিরার কোনো পরিচয় না পেয়েই মনে হল, ও আর-এক জাতের— একালের বাইরে আছে দাঁড়িয়ে, নির্মল আত্মমর্যাদায়, স্পর্শভীরু মেয়ে। মনে মনে কেবলই ভাবছি, প্রথম একটি কথা শুরু করব কী করে।

এই সময়ে কাছাকাছি দুই-একটা ডাকাতি হয়ে গিয়েছিল। মনে হল এই উপলক্ষে অচিরাকে বলি, 'রাজাকে বলে আপনার জন্যে পাহারার বন্দোবস্ত করে দিই!' ইংরেজ মেয়ে হলে হয়তো এই গায়ে-পড়া আনুকূল্যকে স্পর্ধা মনে করত, মাথা বাঁকিয়ে বলত, 'সে ভাবনা আমার'; কিন্তু এই বাঙালির মেয়ে যে কী ভাবে কথাটা নেবে, আমার সে অভিজ্ঞতা নেই। দীর্ঘকাল বাংলার বাইরে থেকে আমার মনের অভ্যাস অনেকখানি জড়িয়ে গেছে বিলিতি সংস্কারে।

দিনের আলো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এইবার অচিরার ঘরে ফেরবার সময়, কিংবা ওর দাদামশায় এসে ওকে বেড়াতে নিয়ে যাবেন। এমন সময়ে একজন হিন্দুস্থানী গোঁয়ার এসে অচিরার হাত থেকে হঠাৎ তার ব্যাগ আর ডায়ারিটা ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিল, আমি সেই মুহূর্তেই বনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বললুম, "কোনো ভয় নেই আপনার।"— এই বলে ছুটে সেই লোকটার ঘাড়ের উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেই সে ব্যাগ আর খাতা ফেলে দৌড় মারলে। আমি লুঠের ধন নিয়ে এসে অচিরাকে দিলুম।

অচিরা বললে, "ভাগ্যিস আপনি—"

আমি বললুম, "আমার কথা বলবেন না, ভাগ্যিস ও লোকটা এসেছিল।"

"তার মানে ?"

"তার মানে, ওরই সাহায্যে আপনার সঙ্গে প্রথম কথাটা হয়ে গেল। এতদিন কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলুম না, কী যে বলি।"

"কিন্তু ও যে ডাকাত।"

"না, ও ডাকাত নয়, ও আমার বরকন্দাজ।"

অচিরা মুখে তার খয়েরি রঙের আঁচল তুলে ধরে খিলখিল করে হেসে উঠল। কী মিষ্টি তার ধ্বনি, যেন ঝরনার স্রোতে নুড়ির_সুর-ওয়ালা শব্দ।

হাসি থামতেই বললে, "কিন্তু সত্যি হলে খুব মজা হত।"

"মজা হত কার পক্ষে।"

"যাকে নিয়ে ডাকাতি তার পক্ষে। এই রকম যে একটা গল্প পড়েছি।"

"তার পরে উদ্ধারকর্তার কী হত।"

"তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে চা খাইয়ে দিতুম।"

"আর এই ফাঁকি উদ্ধারকর্তার কী হবে।"

"তার তো আর-কিছুতে দরকার নেই। সে তো আলাপ করবার

প্রথম কথাটা চেয়েছিল— পেয়েছে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম কথা।”

“গণিতের সংখ্যাগুলো হঠাৎ ফুরবে না তো?”

“কেন ফুরবে।”

“আচ্ছা, আপনি হলে আমাকে প্রথম কথা কী বলতেন।”

“আমি হলে বলতুম, রাস্তায় ঘাটে কতকগুলো নুড়ি কুড়িয়ে কুড়িয়ে কী ছেলেমানুষি করছেন। আপনার কি বয়স হয় নি।”

“কেন বলেন নি।”

“ভয় করেছিল।”

“ভয়? আমাকে ভয়?”

“আপনি যে বড়োলোক। দাদুর কাছে শুনেছি। তিনি যে আপনার লেখা প্রবন্ধ বিলিতি কাগজে পড়েছিলেন। তিনি যা পড়েন আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন।”

“এটাও করেছিলেন?”

“হাঁ, করেছিলেন। কিন্তু লাটিন নামের পাহারার ঘটা দেখে জোড়হাত করে বলেছিলুম, দাদু, এটা থাক্, বরঞ্চ তোমার কোয়ণ্টম থিয়োরির বইখানা নিয়ে আসি।”

“সেটা বুঝি আপনি বুঝতে পারেন?”

“কিছুমাত্র না। কিন্তু দাদুর একটা বদ্ধ সংস্কার আছে— সবাই সবকিছুই বুঝতে পারে। তাঁর সে বিশ্বাস ভাঙতে আমার ভালো লাগে না। তাঁর আর-একটা আশ্চর্য ধারণা আছে— মেয়েদের সহজ-বুদ্ধি পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। তাই ভয়ে ভয়ে আছি এইবার নিশ্চয়ই Time-Space-এর জোড়-মেলানো সম্বন্ধের ব্যাখ্যা আমাকে শুনতে হবে। আসল কথা, মেয়েদের উপর তাঁর করুণার অন্ত নেই। দিদিমা যখন বেঁচে ছিলেন, বড়ো বড়ো কথা পাড়লেই তিনি মুখ বন্ধ করে দিতেন। তাই মেয়েদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যে কতদূর যেতে পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিদিমার কাছ থেকে পান নি। আমি ওঁকে হতাশ করতে পারব না। অনেক শুনেছি, বুঝি নি,

আরো অনেক শুনব আর বুঝব না।”

অচিরার দুই চোখ কৌতুকে স্নেহে জ্বলজ্বল ছলছল করে উঠল। ইচ্ছে করছিল, স্নিগ্ধ কণ্ঠের এই আলাপ শীঘ্র যেন শেষ হয়ে না যায়। দিনের আলো ম্লান হয়ে এল। সন্ধ্যার প্রথম তারা জ্বলে উঠেছে শালবনের মাথার উপরে। সাঁওতাল মেয়েরা জ্বালানি-কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে ঘরে, দূর থেকে শোনা যাচ্ছে তাদের গান।

এমন সময় বাইরে থেকে ডাক এল, “দিদি, কোথায় তুমি? অন্ধকার হয়ে এল যে। আজকাল সময় ভালো নয়।”

“ভালো তো নয়ই দাদু, তাই একজন রক্ষাকর্তা নিযুক্ত করেছি।”

অধ্যাপক আসতেই তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলুম। তিনি শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পরিচয় দিলুম, “আমার নাম নবীনমাধব সেনগুপ্ত।”

বৃদ্ধের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন, “বলেন কী, আপনিই ডাক্তার সেনগুপ্ত? আপনি তো ছেলেমানুষ।”

আমি বললুম, “নিতান্ত ছেলেমানুষ। আমার বয়স ছত্রিশের বেশি নয়।”

আবার অচিরার সেই কলমধুর কণ্ঠের হাসি, আমার মনে যেন দুনো লয়ের ঝংকারে সেতার বাজিয়ে দিলে। বললে, “দাদুর কাছে পৃথিবীর সবাই ছেলেমানুষ, আর দাদু হচ্ছেন সকল ছেলেমানুষের আগরওয়ালা।”

অধ্যাপক বললেন, “আগরওয়ালা? একটা নতুন শব্দ বাংলায় আমদানি করলে। কোথা থেকে জোটালে।”

“সেই যে তোমার ভালোবাসার মাড়োয়ারি ছাত্র, কুন্দনলাল আগরওয়ালা; আমাকে এনে দিত বোতলে করে আমের চাটনি; আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আগরওয়ালা কথাটার মানে কী। সে বলেছিল, পায়োনিয়র।”

অধ্যাপক বললেন, “ডাক্তার সেনগুপ্ত, আপনার সঙ্গে আলাপ

হল যদি, আমাদের ওখানে যেতে হবে তো।"

"কিচ্ছু বলতে হবে না, দাদু। যাবার জন্যে লাফালাফি করছেন। আমার কাছে শুনেছেন, দেশকালের একজোট তত্ত্ব নিয়ে তুমি ব্যাখ্যা করবে আইন্‌স্টাইনের কাঁধে চ'ড়ে।"

মনে মনে বললুম, 'সর্বনাশ। কী দুষ্টুমি।'

অধ্যাপক অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বললেন, "আপনার বুঝি Time-Space-এর—"

আমি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলুম, "কিচ্ছু বুঝি নে Time-Space-এর। আমাকে বোঝাতে গেলে আপনার সময় নষ্ট হবে মাত্র।"

বৃদ্ধ ব্যগ্র হয়ে বলে উঠলেন, "সময়! এখানে সময়ের অভাব কোথায়। আচ্ছা এক কাজ করুন-না, আজকে না-হয় আমাদের ওখানে আহার করবেন, কী বলেন।"

আমি লাফ দিয়ে বলতে যাচ্ছিলুম, 'এখ্‌খনি।'

অচিরা বলে উঠল, "দাদু, সাধে তোমাকে বলি ছেলেমানুষ। যখন-তখন নেমন্তন্ন করে তুমি আমাকে মুশকিলে ফেলো। এই দণ্ডকারণ্যে ফিরপির দোকান পাব কোথায়। ওঁরা বিলেতের ডিনার-খাইয়ে জাতের সর্বগ্রাসী মানুষ, কেন তোমার নাতনীর বদনাম করবে। অন্তত ভেটকি মাছ আর ভেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে তো!"

"আচ্ছা আচ্ছা, তা হলে কবে আপনার সুবিধে হবে বলুন।"

"সুবিধে আমার কালই হতে পারবে। কিন্তু অচিরা দেবীকে বিপন্ন করতে চাই নে। ঘোর জঙ্গলে পাহাড়ে গুহাগহ্বরে আমাকে ভ্রমণে যেতে হয়। সঙ্গে রাখি থলে ভ'রে চিঁড়ে, ছড়া-কয়েক কলা, বিলিতি বেগুন, কাঁচা ছোলার শাক, চিনেবাদামও কখনো থাকে। আমি সঙ্গে নিয়ে আসব ফলারের আয়োজন, অচিরা দেবী দই দিয়ে স্বহস্তে মেখে আমাকে খাওয়াবেন, এতে যদি রাজি থাকেন তা হলে কোনো কথা থাকবে না।"

"দাদু, বিশ্বাস কোরো না এ-সব লোককে। তুমি বাংলা মাসিকে

লিখেছিলে বাঙালির খাদ্যে ভিটেমিনের প্রভাব, সে উনি পড়েছেন, তাই কেবল তোমাকে খুশি করবার জন্যে চিঁড়ে-কলার ফর্দ তোমাকে শোনালেন।”

আমি ভাবলুম, মুশকিলে ফেললে। বাংলা কাগজে ডাক্তারের লেখা ভিটামিনের তত্ত্ব পড়া কোনোকালে আমার দ্বারা সম্ভব নয়; কিন্তু কবুল করি কী করে।— বিশেষত উনি যখন উৎফুল্ল হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “সেটা পড়েছেন নাকি।”

আমি বললুম, “পড়ি বা না-পড়ি তাতে কিছু আসে যায় না, আসল কথা—”

“আসল কথা, উনি নিশ্চয় জানেন কাল যদি ওঁকে খাওয়াই, তা হলে ওঁর পাতে পশুপক্ষী স্থাবরজঙ্গম কিছুই বাদ পড়বে না। সেই-জন্যে অত নিশ্চিন্ত মনে বিলিতি বেগুনের নামকীর্তন করলেন। ওঁর শরীরটার দিকে দেখো না চেয়ে, শুধু শাকান্নে গড়া ব'লে কেউ সন্দেহ করতে পারে? দাদু, তুমি সবাইকেই অত্যন্ত বেশি বিশ্বাস করো, এমন-কি, আমাকেও। সেইজন্যে ঠাট্টা করে তোমাকে কিছু বলতে সাহস করি নে।”

বলতে বলতে ধীরে ধীরে আমরা ওঁদের বাড়ির দিকে চলেছি, এমন সময় হঠাৎ অচিরা বলে উঠল, “এইবার আপনি ফিরে যান বাসায়।”

“কেন, আমি ভেবেছিলুম আপনাদের বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব।”

“ঘর এলোমেলো হয়ে আছে। আপনি বলবেন, বাঙালি মেয়েরা সব অগোছালো। কাল এমন করে সাজিয়ে রাখব যে, মেমসাহেবের কথা মনে পড়বে।”

অধ্যাপক বললেন, “আপনি কিছু মনে করবেন না ডক্টর সেনগুপ্ত, অচি বেশি কথা কচ্ছে, কিন্তু ওর স্বভাব নয় সেটা। এখানে বড়ো নির্জন বলে ও জুড়ে রাখে আমার মনকে অনর্গল কথা

কয়ে। সেটাই ওর অভ্যেস হয়ে গেছে। ও যখন চুপ করে থাকে তখনই আমার ঘরটা যেন ছমছম করতে থাকে, আমার মনটাও। ও জানে সে-কথা। আমার ভয় করে পাছে ওকে কেউ ভুল বোঝে।"

বুড়োর গলা জড়িয়ে ধ'রে অচিরা বললে, "বুঝুক-না দাদু, অত্যন্ত অনিন্দনীয়া হতে চাই নে, সেটা অত্যন্ত আন্‌ইণ্টারেস্টিঙ।"

অধ্যাপক সগর্বে বলে উঠলেন, "জানেন সেনগুপ্ত, আমার দিদি কিন্তু কথা কইতে জানে, অমন আমি কাউকে দেখি নি।"

"তুমি আমার মতো কাউকে দেখো নি দাদু, আমিও কাউকে দেখি নি তোমার মতো।"

আমি বললুম, "আচার্যদেব, যাবার আগে আমাকে কিন্তু একটা কথা দিতে হবে।"

"আচ্ছা বেশ।"

"আপনি যতবার আমাকে আপনি বলেন, আমি মনে মনে ততবার জিভ কাটতে থাকি। আমাকে তুমি যদি বলেন, তা হলে সেটাতেই যথার্থ আপনার স্নেহের সম্মান পাব। এ বাড়িতে আমাকে তুমি-শ্রেণীতে তুলে দিতে আপনার নাতনীও সাহায্য করবেন।"

"সর্বনাশ ! আমি সামান্য নাতনী, হঠাৎ অত উঁচুতে নাগাল পাব না, আপনি বড়োলোক। আমি বলি আর-কিছুদিন যাক, যদি ভুলতে পারি আপনার ডিগ্রিধারী রূপ, তা হলে সবই সম্ভব হবে। কিন্তু দাদুর কথা স্বতন্ত্র। এখনই শুরু করো। দাদু, বলো তো, তুমি কাল খেতে এসো, দিদি যদি মাছের ঝোলে নুন বেশি দিয়ে ফেলে, তা হলে ভালোমানুষের মতো সহ্য কোরো, বোলো, বাঃ, কী চমৎকার, পাতে আরো একটু দিতে হবে।"

অধ্যাপক সস্নেহে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "ভাই, আর-কিছুকাল আগে যদি আমার দিদিকে দেখতে, তা হলে বুঝতে পারতে, আসলে ও লাজুক। সেইজন্যে ও যখন আলাপ করা কর্তব্য মনে

করে, তখন জোর করতে গিয়ে কথা বেশি হয়ে পড়ে।"

"দেখেছেন ডক্টর সেনগুপ্ত, দাদু আমাকে কী রকম মধুর করে শাসন করেন। যেন ইক্ষুদণ্ড দিয়ে। অনায়াসে বলতে পারতেন, তুমি বড়ো মুখরা, তোমার প্রগল্‌ভতা অত্যন্ত অসহ্য। আপনি কিন্তু আমাকে ডিফেণ্ড করবেন। কী বলবেন, বলুন-না।"

"আপনার মুখের সামনে বলব না।"

"বেশি কঠোর হবে ?"

"আপনি জানেন আমার মনের কথা।"

"তা হলে থাক্ ! এখন বাড়ি যান।"

"একটা কথা বাকি আছে। কাল আপনাদের ওখানে যে নেমন্তন্ন সে আমার নতুন নামকরণের। কাল থেকে নবীনমাধব নাম থেকে লোপ পাবে ডাক্তার সেনগুপ্ত। সূর্যের কাছে আনাগোনা করতে গিয়ে ধূমকেতুর যেমন লেজটা যায় উড়ে, মুণ্ডটা থাকে বাকি।"

"তা হলে নামকর্তন বলুন, নামকরণ বলছেন কেন।"

"আচ্ছা, তাই সই।"

এইখানে শেষ হল আমার প্রথম বড়োদিন।

বার্ধক্যের কী প্রশান্ত সৌন্দর্য, কী সৌম্য মূর্তি। চোখদুটি যেন আশীর্বাদ করছে। হাতে একটি পালিশ-করা লাঠি, গলায় শুভ্র পাট-করা চাদর, ধুতি যত্নে কোঁচানো, গায়ে তসরের জামা, মাথায় শুভ্র চুল বিরল হয়ে এসেছে, কিন্তু পরিপাটি করে আঁচড়ানো। স্পষ্ট বোঝা যায় এঁর সাজসজ্জায় এঁর দিনযাত্রায় নাতনীর হাতের শিল্প-কার্য। ইনি যে অতিলালনের অত্যাচার সহ্য করেন, সে কেবল এই মেয়েটিকে খুশি রাখবার জন্যে।

আমার বৈজ্ঞানিক খবরকে ছাড়িয়ে উঠল, এঁদের খবর নেওয়া।

অধ্যাপকের নাম ব্যবহার করব, অনিলকুমার সরকার। গত জেনেরেশনের কেম্ব্রিজ য়ুনিভারসিটির পি-এইচ. ডি. দলের একজন। মাসকয়েক আগে একটি ঔপনাগরিক কলেজের অধ্যক্ষতা ত্যাগ করে

এখানকার স্টেটের একটা পরিত্যক্ত ডাকবাংলা ভাড়া নিয়ে নিজের খরচে সেটা বাসযোগ্য করেছেন। এইটে হল ইতিহাসের খসড়া, বাকিটুকু বঙ্কিমের চিঠি থেকে মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

আমার গল্পের আদিপর্ব শেষ হয়ে গেল। ছোটোগল্পের আদি ও অন্তে বেশি ব্যবধান থাকে না। জিনিসটাকে ফলিয়ে বলবার লোভ করব না, ওর স্বভাব নষ্ট করতে চাই নে।

অচিরার সঙ্গে স্পষ্ট কথা বলার যুগ এল সংক্ষেপেই। সেদিন চড়িভাতি হয়েছিল তনিকা নদীর তীরে।

অধ্যাপক ছেলেমানুষের মতন হঠাৎ আমাকে জিগ্‌গেসা করে বসলেন, "নবীন, তোমার কি বিবাহ হয়েছে।"

প্রশ্নটা এতই সুস্পষ্ট ভাবব্যঞ্জক যে, আর কেউ হলে ওটা চেপে যেত। আমি উত্তর করলুম, "না, এখনো তো হয় নি।"

অচিরার কাছে কোনো কথাই এড়ায় না। সে বললে, "দাদু, ঐ এখনো শব্দটা সংশয়গ্রস্ত কন্যাকর্তাদের মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে। ওর কোনো যথার্থ মানে নেই।"

"একেবারে মানে যে নেই, এ কথা নিশ্চিত স্থির করলেন কী করে।"

"এটা গণিতের প্রব্লেম— তাও হাইয়ার ম্যাথম্যাটিক্‌স বললে যা বোঝায়, তা নয়। পূর্বেই শোনা গেছে, আপনি ছত্রিশ বছরের ছেলেমানুষ। হিসেব করে দেখলুম, এর মধ্যে আপনার মা অন্তত পাঁচ-সাতবার আপনাকে বলেছেন, 'বাবা, ঘরে বউ আনতে চাই।' আপনি বলেছেন, 'তার আগে চাই লোহার সিন্দুকে টাকা আনতে।' মা চোখের জল মুছে চুপ করে রইলেন। তার পরে ইতিমধ্যে আপনার আর-সব হয়েছে, কেবল ফাঁসি ছিল বাকি। শেষকালে এখানকার রাজসরকারে যখন মোটা মাইনের পদ জুটল, মা আবার

বললেন, 'বাবা এবার বিয়ে করতে হবে, আমার আর কদিন-বা সময় আছে।' আপনি বললেন, 'আমার জীবন আর আমার সায়ান্স এক, সে আমি দেশকে উৎসর্গ করব। আমি কোনোদিন বিয়ে করব না।' হতাশ হয়ে আবার তিনি চোখের জল মুছে বসে আছেন। আপনার ছত্রিশ বছর বয়সের গণিতফল গণনা করতে আমার গণনায় ভুল হয়েছে কি না বলুন, সত্যি করে বলুন।"

এ মেয়ের সঙ্গে অনবধানে কথা কওয়া বিপদজনক। কিছুদিন আগেই একটা ব্যাপার ঘটেছিল। প্রসঙ্গক্রমে অচিরা আমাকে বলেছিল, "আমাদের দেশে মেয়েদের আপনারা পান সংসারের সঙ্গিনীরূপে। সংসারে যাদের দরকার নেই, এদেশের মেয়েরাও তাদের কাছে অনাবশ্যক। কিন্তু বিলেতে যারা বিজ্ঞানের তপস্বী, তাদের তো উপযুক্ত তপস্বিনী জোটে, যেমন ছিল অধ্যাপক কুরির সহধর্মিণী মাডাম কুরি। সেরকম কোনো মেয়ে আপনি সে দেশে থাকতে পান নি ?" মনে পড়ে গেল ক্যাথারিনের কথা। একসঙ্গে কাজ করেছি লণ্ডনে থাকতে। এমন-কি, আমার একটা রিসর্চের বইয়ে আমার নামের সঙ্গে তাঁর নামও জড়িত ছিল। মানতে হল কথাটা। অচিরা বললে, "তাঁকে আপনি বিয়ে করলেন না কেন। তিনি কি রাজী ছিলেন না।"

আবার মানতে হল, "হাঁ, প্রস্তাব তাঁর দিক থেকেই উঠেছিল।"

"তবে ?"

"আমার কাজ যে ভারতবর্ষের। শুধু সে তো বিজ্ঞানের নয়।"

"অর্থাৎ ভালোবাসার সফলতা আপনার মতো সাধকের কামনার জিনিস নয়। মেয়েদের জীবনের চরম লক্ষ্য ব্যক্তিগত, আপনাদের নৈর্ব্যক্তিক।"

এর জবাবটা হঠাৎ মুখে এল না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে অচিরা বললে, "বাংলা সাহিত্য আপনি বোধ হয় পড়েন না। কচ ও দেবযানী বলে একটা কবিতা আছে। তাতে ঐ কথাই

আছে, মেয়েদের ব্রত হচ্ছে পুরুষকে বাঁধা, আর পুরুষদের ব্রত সে বাঁধন কাটিয়ে অমরলোকের রাস্তা বানানো। কচ বেরিয়ে পড়েছিল দেবযানীর অনুরোধ এড়িয়ে, আপনি কাটিয়ে এসেছেন মায়ের অনুনয়। একই কথা। মেয়ে-পুরুষের এই চিরকালের দ্বন্দ্বে আপনি জয়ী হয়েছেন। জয় হোক আপনার পৌরুষের। কাঁদুক মেয়েরা, সে কান্না আপনারা নিন পূজার নৈবেদ্য। দেবতার উদ্দেশে আসে নৈবেদ্য, কিন্তু দেবতা থাকেন নিরাসক্ত।"

অধ্যাপক এই আলোচনার মূল লক্ষ্য কিছুই বুঝলেন না। সগর্বে বললেন, "দিদির মুখে গভীর সত্য কেমন বিনা চেষ্টায় প্রকাশ পায়, বাইরের লোকে শুনলে মনে করবে—"

তাঁর কেবলই ভয়, বাইরের লোক তাঁর নাতনীকে ঠিক বুঝতে পারবে না। অচিরা বললে, "বাইরের লোকে মেয়েদের জেঠামি সইতে পারে না, তাদের কথা তুমি ভেবো না। তুমি আমাকে ঠিক বুঝলেই হল।"

অচিরা খুব বড়ো কথাও বলে থাকে হাসির ছলে, কিন্তু আজ সে কী গম্ভীর। আমার একটা কথা আন্দাজে মনে হল, ভবতোষ ওকে বুঝিয়েছিল যে, সে যে ভারত-সরকারের উচ্চ গগনের জ্যোতির্লোক থেকে বধূ এনেছে, তারও লক্ষ্য খুব উচ্চ এবং নিঃস্বার্থ। ব্রিটিশ রাষ্ট্রশাসনের ভাণ্ডার হতেই সে শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে দেশের কাজে লাগাতে। এত সহজ নয় অচিরাকে ছলনা করা। সে যে ভোলে নি, তার প্রমাণ রয়ে গেছে সেই দ্বিখণ্ডিত চিঠির খামটা থেকেই।

অচিরা আবার বললে, "দেবযানী কচকে কী অভিসম্পাত দিয়েছিল জানেন, নবীনবাবু?"

"না।"

"বলেছিল, 'তোমার জ্ঞানসাধনার ধন তুমি নিজে ব্যবহার করতে পারবে না, অন্যকে দান করতে পারবে।' আমার কাছে

কথাটা আশ্চর্য বোধ হয়। যদি এই অভিসম্পাত আজ দিত কেউ য়ুরোপকে, তা হলে সে বেঁচে যেত। বিশ্বের জিনিসকে নিজের জিনিসের মতো ব্যবহার করেই ওরা লোভের তাড়ায় মরছে। সত্যি কি না বলো দাদু।”

“খুব সত্যি কিন্তু আশ্চর্য এই, এত কথা তুমি কী করে ভাবলে।”

“নিজগুণে একটুও নয়। ঠিক এই রকম কথা তোমার কাছে অনেকবার শুনেছি। তোমার একটা মহদ্‌গুণ আছে, ভোলানাথ তুমি, কখন কী বলো, সমস্ত ভুলে যাও। চোরাই মালের উপর নিজের ছাপ লাগিয়ে দিতে ভয় থাকে না।”

আমি বললুম, “চুরি বিদ্যা বড়ো বিদ্যা! বিদ্যায় বলো, রাষ্ট্রেই বলো, বড়ো বড়ো সম্রাট বড়ো বড়ো চোর। আসল কথা, তারাই ছিঁচকে চোর, ছাপ মারবার পূর্বেই যারা ধরা পড়ে।”

অচিরা বললে, “ওঁর কত ছাত্র ওঁর মুখের কথা খাতায় টুকে নিয়ে বই লিখে নাম করেছে। উনি তাদের লেখা পড়ে আশ্চর্য হয়ে প্রশংসা করেন। জানতেই পারেন না, নিজের প্রশংসা নিজেই করছেন! আমার ভাগ্যে এ প্রশংসা প্রায়ই জোটে; নবীনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেই উনি কবুল করবেন, আমার ওরিজিন্যালিটির কথা খাতায় লিখতে শুরু করেছেন, যে খাতায় তাম্রপ্রস্তরযুগের নোট রাখেন। মনে আছে দাদু, অনেক দিনের কথা, যখন কলেজে ছিলে, আমাকে কচ ও দেবযানীর কবিতা শুনিয়েছিলে? সেইদিন থেকে আমি পুরুষের উচ্চ গৌরব মনে মনে মেনেছি, কক্‌খনো মুখে স্বীকার করি নে।”

“কিন্তু দিদি, আমার কোনো কথায় আমি মেয়েদের গৌরবের লাঘব করি নি।”

“তুমি করবে? তুমি যে মেয়েদের অন্ধ ভক্ত, তোমার মুখের স্তবগান শুনে মনে মনে হাসি। মেয়েরা নির্লজ্জ হয়ে সব মেনে নেয়। সস্তায় প্রশংসা আত্মসাৎ করা ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে।”

সেদিন এই-যে কথাবার্তা হয়ে গেল, এ নেহাত হাস্যালাপ নয়। এর মধ্যে ছিল যুদ্ধের সূচনা। অচিরার স্বভাবের দুটো দিক ছিল, আর তার ছিল দুটো আশ্রয়। এক ছিল তাদের নিজেদের বাড়ি আর ছিল সেই পঞ্চবটী। ওর সঙ্গে যখন আমার বেশ সহজ সম্বন্ধ হয়ে এসেছে, তখন স্থির করেছিলুম, ঐ পঞ্চবটীর নিভৃতে হাসি-কৌতুকের ছলে আমার জীবনের সদ্যসংকটের কথা কোনো রকম করে তুলব এবং নিষ্পত্তির দিকে নিয়ে যাব। কিন্তু ওখানে পথ বন্ধ। আমাদের পরিচয়ের প্রথম দিনে প্রথম কথা যেমন মুখে আসছিল না, তেমনি এখানে যে অচিরা আছে তার কাছে প্রথম কথা নেই। মোকাবিলায় ওর চরম মনের কথায় পেঁ ছিবার কোনো উপায় খুঁজে পাই নে। ওর ঘরের কাছে ওর সহাস্যমুখরতা রোধ করে দেয় আমার তরফের এক পা অগ্রগতি। আর ওর নিভৃত বনচ্ছায়ায় আমার সমস্ত চাঞ্চল্য ঠেকিয়ে রেখেছে নির্বাক নিঃশব্দতায়। কোনো কোনোদিন ওদের ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ সভার একটা কোনো সীমানায় মন খোলবার সুযোগ পাওয়া যায়, অচিরা বুঝতে পারে আমি বিপদ-মণ্ডলীর কাছাকাছি আসছি, সেইদিনই ওর বাক্যবাণবর্ষণের অবিরলতা অস্বাভাবিক বেড়ে ওঠে। একটুও ফাঁক পাই নে আর আবহাওয়াও হয়ে ওঠে প্রতিকূল। আমার মন হয়েছে অত্যন্ত অশান্ত, কাজের বাধা এমনি ঘটছে যে, আমি লজ্জা পাচ্ছি মনে মনে। সদরে বাজেটের মিটিঙে আমার রিসর্চ-বিভাগে আরো কিছু টাকা মঞ্জুর করে নেবার প্রস্তাব আছে, তারই সমর্থক রিপোর্ট অর্ধেকের বেশি লেখা হয় নি। ইতিমধ্যে ক্রোচের এস্‌থেটিক্‌স্‌ সম্বন্ধে আলোচনা রোজ কিছুদিন ধরে শুনে আসছি। বিষয়টা সম্পূর্ণ আমার উপলব্ধির এবং উপভোগের বাইরে— সে কথা অচিরা নিশ্চিত জানে। দাদুকে উৎসাহিত করে আর মনে মনে হাসে। সম্প্রতি চলছে behaviourism সম্বন্ধে যত বিরুদ্ধ যুক্তি আছে, তার ব্যাখ্যা। এই তত্ত্বালোচনার শোচনীয়তা হচ্ছে এই যে,

অচিরা এই সময়টাতে ছুটি নিয়ে বাগানের কাজে চলে যায়, বলে, 'এ-সব তর্ক পূর্বেই শুনেছি।' আমি বোকার মতো বসে থাকি, মাঝে মাঝে দরজার দিকে তাকাই। একটা সুবিধে এই যে, অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করেন না— তর্কের কোনো একটা দুরূহ গ্রন্থি বুঝতে পারছি কি না। তাঁর মনে হয় সমস্তই জলের মতো বোঝা যায়।

কিন্তু আর তো চলবে না, কোনো ছিদ্রে আসল কথাটা পাড়তেই হবে। পিক্‌নিকের এক অবকাশে অধ্যাপক যখন পোড়ো মন্দিরের সিঁড়িটাতে বসে নব্য কেমিস্ট্রির নতুন-আমদানির বই পড়ছিলেন, বেঁটে আবলুস গাছের ঝোপের মধ্যে বসে অচিরা হঠাৎ আমাকে বললে, "এই চিরকালের বনের মধ্যে যে একটা অন্ধ প্রাণের শক্তি আছে, ক্রমেই তাকে আমার ভয় করছে।"

আমি বললুম, "আশ্চর্য, ঠিক এই রকমের কথা সেদিন আমি আমার ডায়ারিতে লিখেছি।"

অচিরা বলে চলল, "পুরনো ইমারতের কোনো-একটা ফাটলে লুকিয়ে লুকিয়ে অশথের একটা অঙ্কুর ওঠে, তার পরে শিকড়ে শিকড়ে জড়িয়ে ধ'রে তার সর্বনাশ করে, এও তেমনি। দাদুর সঙ্গে এই কথাটাই হচ্ছিল। দাদু বলছিলেন, লোকালয় থেকে বহুদিন একান্ত দূরে থাকলে মানবচিত্ত প্রকৃতির প্রভাবে দুর্বল হতে থাকে, প্রবল হয়ে ওঠে আদিম প্রাণ-প্রকৃতির প্রভাব। আমি বললুম, এ রকম অবস্থায় কী করা যায়। তিনি বললেন, 'মানুষের চিত্তকে আমরা তো সঙ্গে করে আনতে পারি— ভিড়ের চেয়ে নির্জনে তাকে বরঞ্চ বেশি করে পাই, এই দেখো-না আমার বইগুলি।' দাদুর পক্ষে বলা সহজ, কিন্তু সবাইকে এক ওষুধ খাটে না। আপনি কী বলেন।"

আমি বললুম, "আচ্ছা, বলব। আমার কথাটা ঠিকমত বুঝে দেখবেন। আমার মত এই যে, এই রকম জায়গায় এমন একজন মানুষের সঙ্গ সমস্ত অন্তর বাহিরে পাওয়া চাই, যার প্রভাব মানব-প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ ক'রে রাখতে পারে। যতক্ষণ না পাই ততক্ষণ

অন্ধশক্তির কাছে কেবলই হার ঘটতে থাকবে। আপনি যদি সাধারণ মেয়েদের মতো হতেন, তা হলে আপনার কাছে সত্য কথা শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট করে বলতে মুখে বাধত।"

অচিরা বললে, "বলুন আপনি, দ্বিধা করবেন না।"

বললুম, "আমি সায়ন্টিস্ট, যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা ইম্পার্সোনাল ভাবে বলব। আপনি একদিন ভবতোষকে অত্যন্ত ভালোবেসেছিলেন। আজও কি আপনি তাঁকে তেমনি ভালোবাসেন।"

"আচ্ছা, মনে করুন, বাসি নে।"

"আমিই আপনার মনকে সরিয়ে এনেছি।"

"তা হতে পারে, কিন্তু একলা আপনি নন, বনের ভিতরকার এই ভীষণ অন্ধশক্তি। সেইজন্যে আমি এই সরে আসাকে শ্রদ্ধা করি নে, লজ্জা পাই।"

"কেন করেন না।"

"দীর্ঘকালের প্রয়াসে মানুষ চিত্তশক্তিতে নিজের আদর্শকে গড়ে তোলে, প্রাণশক্তির অন্ধতা তাকে ভাঙে। আপনার দিকে আমার যে ভালোবাসা, সে সেই অন্ধশক্তির আক্রমণে।"

"ভালোবাসাকে আপনি এমন করে গঞ্জনা দিচ্ছেন নারী হয়ে?"

"নারী বলেই দিচ্ছি। ভালোবাসার আদর্শ আমাদের পূজার জিনিস। তাকেই বলে সতীত্ব। সতীত্ব একটা আদর্শ। এ জিনিসটা বনের প্রকৃতির নয়, মানবীর। এ নির্জনে এতদিন সেই আদর্শকে আমি পূজা করছিলুম সকল আঘাত সকল বঞ্চনা সত্ত্বেও। তাকে রক্ষা করতে না পারলে আমার শুচিতা থাকে না।"

"আপনি শ্রদ্ধা করতে পারেন ভবতোষকে?"

"না।"

"তার কাছে যেতে পারেন?"

"না। কিন্তু সে আর আমার সেই জীবনের প্রথম ভালোবাসা, এক নয়। এখন আমার কাছে সেই ভালোবাসা ইম্পার্সোনাল।

কোনো আধারের দরকার নেই।”

“ভালো বুঝতে পারছি নে।”

“আপনি বুঝতে পারবেন না। আপনাদের সম্পদ জ্ঞানের—উচ্চতম শিখরে সে জ্ঞান ইম্পার্সোনাল। মেয়েদের সম্পদ হৃদয়ের, যদি তার সব হারায়—যা কিছু বাহ্যিক, যা দেখা যায়, ছোঁওয়া যায়, ভোগ করা যায়, তবু বাকি থাকে তার সেই ভালোবাসার আদর্শ যা অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ। অর্থাৎ ইম্পার্সোনাল।”

আমি বললুম, “দেখুন, তর্ক করবার সময় আর নেই। এখানকার কাগজে বোধ হয় দেখে থাকবেন, আমার এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে। অ্যাসিস্টাণ্ট্ জিয়লজিস্ট লিখেছেন, এখান থেকে আরো কিছু দূরে সন্ধানের কাজ আরম্ভ করতে হবে, কিন্তু—”

“কেন গেলেন না।”

“আপনার কাছ থেকে—”

“আমার কাছ থেকে শেষ কথাটা শুনতে চান, প্রথম কথাটা পূর্বেই আদায় করা হয়েছে!”

“হাঁ, ঠিক তাই।”

“তা হলে কথাটা পরিষ্কার করে বলি। আমার ঐ পঞ্চবটীর মধ্যে বসে আপনার অগোচরে কিছুকাল আপনাকে দেখেছি। সমস্ত দিন পরিশ্রম করেছেন, মানেন নি প্রখর রৌদ্রের তাপ। কোনো দরকার হয় নি কারো সঙ্গের। এক-একদিন মনে হয়েছে হতাশ হয়ে গেছেন, যেটা পাবেন নিশ্চিত করেছিলেন সেটা পান নি। কিন্তু তার পরদিন থেকেই আবার অক্লান্ত মনে খোঁড়াখুঁড়ি চলেছে। বলিষ্ঠ দেহকে বাহন করে বলিষ্ঠ মনের যেন জয়যাত্রা চলছে। এমনতরো বিজ্ঞানের তপস্বী আমি আর কখনো দেখি নি। দূরে থেকে ভক্তি করেছি।”

“এখন বুঝি—”

“না, বলি শুনুন। আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় যতই এগিয়ে চলল, ততই দুর্বল হল সেই সাধনা। নানা তুচ্ছ উপলক্ষে কাজে

বাধা পড়তে লাগল। তখন ভয় হল নিজেকে, এই নারীকে। ছি ছি, কী পরাজয়ের বিষ এনেছি আমার মধ্যে। এই তো আপনার দিকের কথা, এখন আমার কথাটা বলি। আমারও একটা সাধনা ছিল, সেও তপস্যা। তাতে আমার জীবনকে পবিত্র করবে, উজ্জ্বল করবে, এ আমি নিশ্চয় জানতুম। দেখলুম ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছি—যে চাঞ্চল্য আমাকে পেয়ে বসেছিল, তার প্রেরণা এই ছায়াছন্ন বনের নিশ্বাসের ভিতর থেকে, সে আদিম প্রাণের শক্তির। মাঝে মাঝে এখানকার রাক্ষসী রাত্রির দ্বারা আবিষ্ট হয়ে মনে হয়েছে, একদিন আমার দাদুর কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে বুঝি এমন প্রবৃত্তিরাক্ষস আছে। তার বিশ হাত দিনে দিনে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তখনই বিছানা ফেলে ছুটে গিয়ে ঝরনার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি স্নান করেছি।”

এই কথা বলতে বলতে অচিরা ডাক দিলে, “দাদু।”

অধ্যাপক তাঁর পড়া ফেলে রেখে কাছে এসে মধুর স্নেহে বললেন, “কী দিদি।”

“তুমি সেদিন বলছিলে না, মানুষের সত্য তার তপস্যার ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে?— তার অভিব্যক্তি বায়োলজির নয়।”

“হ্যাঁ, তাই তো আমি বলি। পৃথিবীতে বর্বর মানুষ জন্তুর পর্যায়ে। কেবলমাত্র তপস্যার ভিতর দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মানুষ। আরো তপস্যা সামনে আছে, আরো স্থূলত্ব বর্জন করতে হবে, তবে সে হবে দেবতা। পুরাণে দেবতার কল্পনা আছে, কিন্তু অতীতে দেবতা ছিলেন না, দেবতা আছেন ভবিষ্যতে, মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।”

“দাদু, এইবার তোমার আমার কথাটা চুকিয়ে দিই। কদিন থেকে মনের মধ্যে তোলপাড় করছে।”

আমি উঠে পড়ে বললুম, “তা হলে আমি যাই।”

“না, আপনি বসুন। দাদু, তোমার সেই কলেজের যে অধ্যক্ষ-পদ তোমার ছিল, সেটা আবার খালি হয়েছে। সেক্রেটরি খুব

অনুনয় করে তোমাকে লিখেছেন সেই পদ ফিরে নিতে। তুমি আমাকে সব চিঠি দেখাও, কেবল এই চিঠিটাই দেখাও নি। তাতেই তোমার দুরভিসন্ধি সন্দেহ করে ঐ চিঠিটা চুরি করে দেখেছি।”

“আমারই অন্যায় হয়েছিল।”

“কিচ্ছু অন্যায় হয় নি। আমি তোমাকে টেনে এনেছি তোমার আসন থেকে নীচে। আমরা কেবল নামিয়ে আনতেই আছি।”

“কী বলছ দিদি।”

“সত্যি কথাই বলছি। বিশ্বজগৎ না থাকলে বিধাতার হাত খালি হয়, ছাত্র না থাকলে তোমার তেমনি। সত্যি কথা বলো।”

“বরাবর ইস্কুলমাস্টারি করেছি কিনা, তাই—”

“তুমি আবার ইস্কুলমাস্টার! তুমি born teacher, তুমি আচার্য। তোমার জ্ঞানের সাধনা নিজের জন্যে নয়, অন্যকে দানের জন্যে। দেখেন নি নবীনবাবু, মাথায় একটা আইডিয়া এলে আমাকে নিয়ে পড়েন, দয়ামায়া থাকে না; বারো-আনা বুঝতে পারি নে; নইলে আপনাকে নিয়ে বসেন, সে আরো শোচনীয় হয়ে ওঠে। আপনার মন যে কোন্ দিকে বুঝতেই পারেন না, ভাবেন বিশুদ্ধ জ্ঞানের দিকে। দাদু, ছাত্র তোমার নিতান্তই চাই, কিন্তু বাছাই করে নিতে ভুলো না।”

অধ্যাপক বললেন, “ছাত্রই তো শিক্ষককে বাছাই করে, গরজ তো তারই।”

“আচ্ছা, সে কথা পরে হবে। সম্প্রতি আমার চৈতন্য হয়েছে, যিনি শিক্ষক তাঁকে গ্রন্থকীট করে তুলছি। এমনি করে তপস্যা ভাঙি নিজের অন্ধ-গরজে। সে কাজ তোমাকে নিতে হবে, এখনই যেতে হবে সেখানে ফিরে।”

অধ্যাপক হতবুদ্ধির মতো অচিরার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। অচিরা বললে, “ও, বুঝেছি, তুমি ভাবছ আমার কী গতি হবে। আমার গতি তুমি। ভোলানাথ, আমাকে যদি তোমার পছন্দ না

হয়, তা হলে দিদিমা দি সেকেণ্ডের আমদানি করতে হবে, তোমার লাইব্রেরি বেচে তাঁর গয়না বানিয়ে দেবে, আমি দেব লম্বা দৌড়। অত্যন্ত অহংকার না বাড়লে এ কথা তোমাকে মানতেই হবে, আমাকে না হলে একদিনও তোমার চলে না। আমার অনুপস্থিতিতে পনেরোই আশ্বিনকে পনেরোই অক্টোবর বলে তোমার ধারণা হয়, যেদিন বাড়িতে তোমার সহযোগী অধ্যাপকের নিমন্ত্রন্ন, সেইদিনই লাইব্রেরি ঘরে দরজা বন্ধ করে নিদারুণ একটা ইকোয়েশন কষতে লেগে যাও। গাড়িতে চড়ে ড্রাইভরকে যে ঠিকানা দাও, সে ঠিকানায় আজও বাড়ি তৈরি হয় নি। নবীনবাবু মনে করছেন আমি অত্যুক্তি করছি।”

আমি বললুম, “একেবারেই না। কিছুদিন তো ওঁকে দেখছি, তার থেকেই অসন্দিগ্ধ বুঝেছি, আপনি যা বলছেন তা খাঁটি সত্য।”

“আজ এত অলুক্ষণে কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে কেন। জানো নবীন, এই রকম যা-তা বলবার উপসর্গ ওর সম্প্রতি দেখা দিয়েছে।”

“সব লক্ষণ শান্ত হয়ে যাবে, তুমি চলো দেখি তোমার কাজে। নাড়ী আবার ফিরে আসবে। থামবে প্রলাপ-বকুনি।”

অধ্যাপক আমার দিকে চেয়ে বললেন, “তোমার কী পরামর্শ নবীন।”

উনি পণ্ডিত মানুষ বলেই জিয়লজিস্টের বুদ্ধির ’পরে ওঁর এত শ্রদ্ধা। আমি একটুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললুম, “অচিরা দেবীর চেয়ে সত্য পরামর্শ আপনাকে কেউ দিতে পারবে না।”

অচিরা উঠে দাঁড়িয়ে পা ছুঁয়ে আমাকে প্রণাম করলে। আমি সংকুচিত হয়ে পিছু হঠে গেলুম। অচিরা বললে, “সংকোচ করবেন না, আপনার তুলনায় আমি কেউ নই। সে কথাটা একদিন স্পষ্ট হবে। এইখানেই শেষ বিদায় নিলুম। যাবার আগে আর কিন্তু দেখা হবে না।”

অধ্যাপক আশ্চর্য হয়ে বললেন, “সে কী কথা দিদি।”

“দাদু, তুমি অনেক কিছু জানো, কিন্তু অনেক কিছু সম্বন্ধে

তোমার চেয়ে আমার বুদ্ধি অনেক বেশি, সবিনয়ে এ কথাটা স্বীকার করে নিয়ো।”

আমি পদধূলি নিয়ে প্রণাম করলুম অধ্যাপককে। তিনি আমাকে বুকে আলিঙ্গন করে ধরে বললেন, “আমি জানি সামনে তোমার কীর্তির পথ প্রশস্ত।”

এইখানে আমার ছোটোগল্প ফুরল। তার পরেকার কথা জিয়ল-জিস্টের। বাড়ি ফিরে গিয়ে কাজের নোট এবং রেকর্ডগুলো আবার খুললুম। মনে হঠাৎ খুব একটা আনন্দ জাগল— বুঝলুম একেই বলে মুক্তি। সন্ধ্যাবেলায় দিনের কাজ শেষ করে বারান্দায় এসে বোধ হল— খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে এক টুকরো শিকল। নড়তে-চড়তে সেটা বাজে।

ল্যাবরেটরি

নন্দকিশোর ছিলেন লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি থেকে পাস করা এঞ্জিনিয়র। যাকে সাধুভাষায় বলা যেতে পারে দেদীপ্যমান ছাত্র অর্থাৎ ব্রিলিয়াণ্ট, তিনি ছিলেন তাই। স্কুল থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার তোরণে তোরণে ছিলেন পয়লা শ্রেণীর সওয়ারী।

ওঁর বুদ্ধি ছিল ফলাও, ওঁর প্রয়োজন ছিল দরাজ, কিন্তু ওঁর অর্থসম্বল ছিল আঁটমাপের।

রেলোয়ে কোম্পানির ছুটো বড়ো ব্রিজ তৈরি করার কাজের মধ্যে উনি ঢুকে পড়তে পেরেছিলেন। ও কাজের আয়ব্যয়ের বাড়তিপড়তি বিস্তর, কিন্তু দৃষ্টান্তটা সাধু নয়। এই ব্যাপারে যখন তিনি ডান হাত বাঁ হাত ছুই হাতই জোরের সঙ্গে চালনা করেছিলেন তখন তাঁর মন খুঁতখুঁত করে নি। এসব কাজের দেনাপাওনা নাকি কোম্পানি নামক একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট সত্তার সঙ্গে জড়িত, সেইজন্যে কোনো ব্যক্তিগত লাভলোকসানের তহবিলে এর পীড়া পোঁছয় না।

ওঁর নিজের কাজে কর্তারা ওঁকে জিনিয়স বলত, নিখুঁত হিসাবের মাথা ছিল তাঁর। বাঙালি বলেই তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক তাঁর জোটে নি। নীচের দরের বিলিতি কর্মচারী প্যাণ্টের ছুই ভরা পকেটে হাত গুঁজে যখন পা ফাঁক করে 'হ্যালো মিস্টার মল্লিক' বলে ওঁর পিঠথাবড়া দিয়ে কর্তাত্বি করত তখন ওঁর ভালো লাগত না। বিশেষত যখন কাজের বেলা ছিলেন উনি, আর দামের বেলা আর নামের বেলা ওরা। এর ফল হয়েছিল এই যে নিজের ন্যায্য প্রাপ্য টাকার একটা প্রাইভেট হিসেব ওঁর মনের মধ্যে ছিল, সেটা পুষিয়ে নেবার ফন্দি জানতেন ভাল করেই।

পাওনা এবং অপাওনার টাকা নিয়ে নন্দকিশোর কোনোদিন বাবুগিরি করেন নি। থাকতেন শিকদারপাড়া গলির একটা দেড়তলা বাড়িতে। কারখানা ঘরের দাগ-দেওয়া কাপড় বদলাবার ওঁর সময়

ছিল না। কেউ ঠাট্টা করলে বলতেন, 'মজুর মহারাজের তকমা-পরা আমার এই সাজ।'

কিন্তু বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ ও পরীক্ষার জন্যে বিশেষ করে তিনি বাড়ি বানিয়ে ছিলেন খুব মস্ত। এমন মশগুল ছিলেন নিজের শখ নিয়ে যে, কানে উঠত না লোকেরা বলাবলি করছে, এত বড়ো ইমারতটা যে আকাশ ফুঁড়ে উঠল— আলাদিনের প্রদীপটা ছিল কোথায়।

একরকমের শখ মানুষকে পেয়ে বসে সেটা মাতলামির মতো, হুঁশ থাকে না যে লোকে সন্দেহ করছে। লোকটা ছিল সৃষ্টিছাড়া, ওঁর ছিল বিজ্ঞানের পাগলামি। ক্যাটালগের তালিকা ওলটাতে ওলটাতে ওঁর সমস্ত মনপ্রাণ চৌকির দুই হাতা আঁকড়ে ধরে উঠত ঝেঁকে ঝেঁকে। জর্মনি থেকে আমেরিকা থেকে এমন-সব দামী দামী যন্ত্র আনাতেন যা ভারতবর্ষের বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে মেলে না। এই বিদ্যালোভীর মনে সেই তো ছিল বেদনা। এই পোড়া দেশে জ্ঞানের ভোজের উচ্ছিষ্ট নিয়ে সস্তা দরের পাত পাড়া হয়। ওদের দেশে বড়ো বড়ো যন্ত্র ব্যবহারের যে সুযোগ আছে আমাদের দেশে না থাকাতেই ছেলেরা টেক্সট্ বুকের শুকনো পাতা থেকে কেবল এঁটোকাঁটা হাতড়িয়ে বেড়ায়। উনি হেঁকে উঠে বলতেন, ক্ষমতা আছে আমাদের মগজে, অক্ষমতা আমাদের পকেটে। ছেলেদের জন্যে বিজ্ঞানের বড়ো রাস্তাটা খুলে দিতে হবে বেশ চওড়া করে, এই হল ওঁর পণ।

দুর্মূল্য যন্ত্র যত সংগ্রহ হতে লাগল, ওঁর সহকর্মীদের ধর্মবোধ ততই অসহ্য হয়ে উঠল। এই সময়ে ওঁকে বিপদের মুখ থেকে বাঁচালেন বড়োসাহেব। নন্দকিশোরের দক্ষতার উপর তাঁর প্রচুর শ্রদ্ধা ছিল। তা ছাড়া রেলোয়ে কাজে মোটা মোটা মুঠোর অপসারণদক্ষতার দৃষ্টান্ত তাঁর জানা ছিল।

চাকরি ছাড়তে হল। সাহেবের আনুকূল্যে রেল কোম্পানির পুরনো লোহালক্কড় সস্তা দামে কিনে নিয়ে কারখানা ফেঁদে বসলেন। তখন য়ুরোপের প্রথম যুদ্ধের বাজার সরগরম। লোকটা অসামান্য

কৌশলী, সেই বাজারে নতুন নতুন খালে নালায় তাঁর মুনফার টাকায় বান ডেকে এল।

এমন সময় আর-একটা শখ পেয়ে বসল ওঁকে।

এক সময়ে নন্দকিশোর পাঞ্জাবে ছিলেন তাঁর ব্যাবসার তাগিদে। সেখানে জুটে গেল তাঁর এক সঙ্গিনী। সকালে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন, বিশ বছরের মেয়েটি ঘাগরা দুলিয়ে অসংকোচে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত— জ্বলজ্বলে তার চোখ, ঠোঁটে একটি হাসি আছে— যেন শান-দেওয়া ছুরির মতো। সে ওঁর পায়ের কাছে ঘেঁষে এসে বললে, "বাবুজি, আমি কয়দিন ধরে এখানে এসে দুবেলা তোমাকে দেখছি। আমার তাজ্জব লেগে গেছে।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "কেন, এখানে তোমাদের চিড়িয়াখানা নেই নাকি।"

সে বললে, "চিড়িয়াখানার কোনো দরকার নেই। যাদের ভিতরে রাখবার, তারা বাইরে সব ছাড়া আছে। আমি তাই মানুষ খুঁজছি।"

"খুঁজে পেলে!"

নন্দকিশোরকে দেখিয়ে বললে, "এই তো পেয়েছি।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "কী গুণ দেখলে বলো দেখি।"

ও বললে, "এখানকার বড়ো বড়ো সব শেঠজি, গলায় মোটা সোনার চেন, হাতে হীরার আংটি, তোমাকে ঘিরে এসেছিল— ভেবেছিল বিদেশী, বাঙালি, কারবার বোঝে না। শিকার জুটেছে ভালো। কিন্তু দেখলুম তাদের একজনেরও ফন্দি খাটল না। উলটে ওরা তোমারই ফাঁসকলে পড়েছে। কিন্তু তা ওরা এখনো বোঝে নি —আমি বুঝে নিয়েছি।"

নন্দকিশোর চমকে গেল কথা শুনে। বুঝলে, একটি চিজ বটে— সহজ নয়।

মেয়েটি বললে, "আমার কথা তোমাকে বলি— তুমি শুনে রাখো। আমাদের পাড়ায় একজন ডাকসাইটে জ্যোতিষী আছে। সে আমার

কুষ্টি গণনা করে বলেছিল, একদিন ছুনিয়ায় আমার নাম জাহির হবে। বলেছিল আমার জন্মস্থানে শয়তানের দৃষ্টি আছে।”

নন্দকিশোর বললে, “বলো কী। শয়তানের ?”

মেয়েটি বললে, “জানো তো বাবুজি—জগতে সবচেয়ে বড়ো নাম হচ্ছে ঐ শয়তানের। তাকে যে নিন্দে করে করুক, কিন্তু সে খুব খাঁটি। আমাদের বাবা বোম্‌-ভোলানাথ ভোঁ হয়ে থাকেন। তাঁর কর্ম নয় সংসার চালানো। দেখো-না, সরকার বাহাছুর শয়তানির জোরে ছুনিয়া জিতে নিয়েছে, খৃস্টানির জোরে নয়। কিন্তু ওরা খাঁটি, তাই রাজ্য রক্ষা করতে পেরেছে। যেদিন কথার খেলাপ করবে, সেদিন ঐ শয়তানেরই কাছে কানমলা খেয়ে মরবে।”

নন্দকিশোর আশ্চর্য হয়ে গেল।

মেয়েটি বললে, “বাবু, রাগ কোরো না। তোমার মধ্যে ঐ শয়তানের মন্তর আছে। তাই তোমারই হবে জিত। অনেক পুরুষকেই আমি ভুলিয়েছি, কিন্তু আমার উপরেও টেক্কা দিতে পারে এমন পুরুষ আজ দেখলুম। আমাকে তুমি ছেড়ো না বাবু—তা হলে তুমি ঠকবে।”

নন্দকিশোর হেসে বললে, “কী করতে হবে।”

“দেনার দায়ে আমার আইমার বাড়িঘর বিক্রি হয়ে যাচ্ছে—তোমাকে সেই দেনা শোধ করে দিতে হবে।”

“কত টাকা দেনা তোমার।”

“সাত হাজার টাকা।”

নন্দকিশোরের চমক লাগল—ওর দাবির সাহস দেখে। বললে, “আচ্ছা আমি দিয়ে দেব, কিন্তু তার পরে ?”

“তার পরে আমি তোমার সঙ্গ কখনো ছাড়ব না।”

“কী করবে তুমি।”

“দেখব—যেন কেউ তোমায় ঠকাতে না পারে আমি ছাড়া।”

নন্দকিশোর হেসে বললেন, “আচ্ছা বেশ—রইল কথা—এই

পরো আমার আংটি।”

কষ্টিপাথর আছে ওঁর মনে, তার উপরে দাগ পড়ল একটা দামী ধাতুর। দেখতে পেলেন মেয়েটির ভিতর থেকে ঝক্ ঝক্ করছে ক্যারেকটরের তেজ—বোঝা গেল ও নিজের দাম নিজে জানে, তাতে একটুমাত্র সংশয় নেই। নন্দকিশোর অনায়াসে বললে ‘দেব টাকা’— দিলে সাত হাজার বুড়ি আইমাকে।

মেয়েটিকে ডাকত সবাই সোহিনী ব'লে। পশ্চিমী ছাঁদের সুকঠোর এবং সুন্দর তার চেহারা। কিন্তু চেহারায় মন টলাবে, নন্দকিশোর সে জাতের লোক ছিলেন না। যৌবনের হাটে মন নিয়ে জুয়ো খেলবার সময়ই ছিল না তাঁর।

নন্দকিশোর ওকে যে-দশা থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেটা খুব নির্মল নয়, এবং নিভৃত নয়। কিন্তু ঐ একরোখা একগুঁয়ে মানুষ সাংসারিক প্রয়োজন বা প্রথাগত বিচারকে গ্রাহ্য করতেন না। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করত, বিয়ে করেছ কি। উত্তরে শুনত, বিয়েটা খুব বেশি মাত্রায় নয়, সহ্যমত। লোকে হাসত যখন দেখত উনি স্ত্রীকে নিজের বিদ্যের ছাঁচে গড়ে তুলতে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করত, “ও কি প্রোফেসারি করতে যাবে নাকি।” নন্দ বলতেন, “না, ওকে নন্দকিশোরি করতে হবে, সেটা যে-সে মেয়ের কাজ নয়।” বলত, “আমি অসবর্ণ-বিবাহ পছন্দ করি নে।”

“সে কী হে।”

“স্বামী হবে এঞ্জিনিয়র আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনী, এটা মানবধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ঘরে ঘরে দেখতে পাই দুই আলাদা আলাদা জাতে গাঁটছড়া বাঁধা, আমি জাত মিলিয়ে নিচ্ছি। পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও।”

২

নন্দকিশোর মারা গেলেন প্রৌঢ় বয়সে কোন্‌-এক দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অপঘাতে।

সোহিনী সমস্ত কারবার বন্ধ করে দিলে। বিধবা মেয়েদের ঠকিয়ে খাবার ব্যাবসাদার এসে পড়ল চার দিক থেকে। মামলার ফাঁদ ফাঁদলে আত্মীয়তার ছিটেফোঁটা আছে যাদের। সোহিনী স্বয়ং সমস্ত আইনের প্যাঁচ নিতে লাগল বুঝে। তার উপরে নারীর মোহজাল বিস্তার করে দিলে স্থান বুঝে উকিলপাড়ায়। সেটাতে তার অসংকোচ নৈপুণ্য ছিল, সংস্কার মানার কোনো বালাই ছিল না। মামলায় জিতে নিলে একে একে, দূর সম্পর্কের দেওর গেল জেলে দলিল জাল করার অপরাধে।

ওদের একটি মেয়ে আছে, তার নামকরণ হয়েছিল নীলিমা। মেয়ে স্বয়ং সেটিকে বদল করে নিয়েছে— নীলা। কেউ না মনে করে, বাপ-মা মেয়ের কালো রঙ দেখে একটা মোলায়েম নামের তলায় সেই নিন্দেটি চাপা দিয়েছে। মেয়েটি একেবারে ফুটফুটে গৌরবর্ণ। মা বলত, ওদের পূর্বপুরুষ কাশ্মীর থেকে এসেছিল, মেয়ের দেহে ফুটেছে কাশ্মীরী শ্বেতপদ্মের আভা, চোখেতে নীলপদ্মের আভাস, আর চুলে চমক দেয় যাকে বলে পিঙ্গলবর্ণ।

মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গে কুলশীল জাতগুষ্টির কথা বিচার করবার রাস্তা ছিল না। একমাত্র ছিল মন ভোলাবার পথ, শাস্ত্রকে ডিঙিয়ে গেল তার ভেলকি। অল্পবয়সের মাড়োয়ারি ছেলে, তার টাকা পৈতৃক, শিক্ষা একালের। অকস্মাৎ সে পড়ল এসে অনঙ্গের অলক্ষ্য ফাঁদে। নীলা একদিন গাড়ির অপেক্ষায় ইস্কুলের দরজার কাছে ছিল দাঁড়িয়ে। সেই সময় ছেলেটি দৈবাৎ তাকে দেখেছিল। তার পর থেকে আরো কিছুদিন ঐ রাস্তায় সে বায়ুসেবন করেছে। স্বাভাবিক স্ত্রী-বুদ্ধির প্রেরণায় মেয়েটি গাড়ি আসবার বেশ কিছুক্ষণ পূর্বেই

গেটের কাছে দাঁড়াত। কেবল সেই মাড়োয়ারি ছেলে নয়, আরো দুচার সম্প্রদায়ের যুবক ঐখানটায় অকারণ পদচারণার চর্চা করত। তার মধ্যে ঐ ছেলেটিই চোখ বুজে দিল ঝাঁপ ওর জালের মধ্যে। আর ফিরল না। সিভিল মতে বিয়ে করলে সমাজের ওপারে। বেশি দিনের মেয়াদে নয়। তার ভাগ্যে বধূটি এল প্রথমে, তার পরে দাম্পত্যের মাঝখানটাতে দাঁড়ি টানলে টাইফয়েড, তার পরে মুক্তি।

সৃষ্টিতে অনাসৃষ্টিতে মিশিয়ে উপদ্রব চলতে লাগল। মা দেখতে পায় তার মেয়ের ছটফটানি। মনে পড়ে নিজের প্রথম বয়সের জ্বালামুখীর অগ্নিচাঞ্চল্য। মন উদ্‌বিগ্ন হয়। খুব নিবিড় করে পড়া-শোনার বেড়া ফাঁদতে থাকে। পুরুষ শিক্ষক রাখল না। একজন বিদুষীকে লাগিয়ে দিল ওর শিক্ষকতায়। নীলার যৌবনের আঁচ লাগত তারও মনে, তুলত তাকে তাতিয়ে অনির্দেশ্য কামনার তপ্ত-বাষ্পে। মুগ্ধের দল ভিড় করে আসতে লাগল এ দিকে ও দিকে। কিন্তু দরওয়াজা বন্ধ। বন্ধুত্ব-প্রয়াসিনীরা নিমন্ত্রণ করে চায়ে টেনিসে সিনেমায়, নিমন্ত্রণ পৌঁছয় না কোনো ঠিকানায়। অনেক লোভী ফিরতে লাগল মধুগন্ধভরা আকাশে, কিন্তু কোনো অভাগ্য কাঙাল সোহিনীর ছাড়পত্র পায় না। এ দিকে দেখা যায় উৎকণ্ঠিত মেয়ে সুযোগ পেলে উঁকিঝুঁকি দিতে চায় অজায়গায়। বই পড়ে যে-বই টেক্সট্ বুক কমিটির অনুমোদিত নয়, ছবি গোপনে আনিয়ে নেয় যা আর্ট শিক্ষার আনুকূল্য করে বলে বিড়ম্বিত। ওর বিদুষী শিক্ষয়িত্রীকে পর্যন্ত অন্যমনস্ক করে দিলে। ডায়োশিসন থেকে বাড়ি ফেরবার পথে আলুথালু চুলওয়ালা গোঁফের-রেখামাত্র-দেওয়া সুন্দরহানো এক ছেলে ওর গাড়িতে চিঠি ফেলে দিয়েছিল। ওর রক্ত উঠেছিল ছম ছম করে। চিঠিখানা লুকিয়ে রেখেছিল জামার মধ্যে। ধরা পড়ল মায়ের কাছে। সমস্ত দিন ঘরে বন্ধ থেকে কাটল অনাহারে।

সোহিনীর স্বামী যাদের বৃত্তি দিয়েছিলেন, সেই-সব ভালো ভালো ছাত্রমহলে সোহিনী পাত্র সন্ধান করেছে। সবাই প্রায় আড়ে আড়ে

ওর টাকার থলির দিকে তাকায়। একজন তো তার থিসিস ওর নামে উৎসর্গ করে বসল। ও বললে, "হায় রে কপাল, লজ্জায় ফেললে আমাকে। তোমার পোস্টগ্রাজুয়েটী মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে শুনলুম, অথচ মালাচন্দন দিলে অজায়গায়, হিসাব করে ভক্তি না করলে উন্নতি হবে না যে।" কিছুদিন থেকে একটি ছেলের দিকে সোহিনী দৃষ্টিপাত করছিল। ছেলেটি পছন্দসই বটে। তার নাম রেবতী ভট্টাচার্য। এরি মধ্যে সায়ান্সের ডাক্তার পদবীতে চড়ে বসেছে। ওর ছুটো-একটা লেখার যাচাই হয়ে গেছে বিদেশে।

৩

লোকের সঙ্গে মেলামেশা করবার কলাকৌশল সোহিনীর ভালো করেই জানা আছে। মন্মথ চৌধুরী রেবতীর প্রথম দিককার অধ্যাপক। তাঁকে নিলে বশ করে। কিছুদিন চায়ের সঙ্গে রুটিটোস্ট, অমলেট, কখনো বা ইলিশমাছের ডিমের বড়া খাইয়ে কথাটা পাড়লে। বললে, "আপনি হয়তো ভাবছেন আমি আপনাকে বারে বারে চা খেতে ডাকি কেন।"

"মিসেস মল্লিক, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলতে পারি, সেটা আমার ছুর্ভাবনার বিষয় নয়।"

সোহিনী বললে, "লোকে ভাবে, আমরা বন্ধুত্ব করে থাকি স্বার্থের গরজে।"

"দেখো মিসেস মল্লিক, আমার মত হচ্ছে এই— গরজটা যারই হোক, বন্ধুত্বটাই তো লাভ। আর এই বা কম কথা কী, আমার মতো অধ্যাপককে দিয়েও কারো স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে। এ জাতটার বুদ্ধি কেতাবের বাইরে হাওয়া খেতে পায় না বলে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আমার কথা শুনে তোমার হাসি পাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। দেখো, যদিও আমি মাস্টারি করি তবু ঠাট্টা করতেও পারি। দ্বিতীয়বার চা খেতে

ডাকবার পূর্বে এটা জেনে রাখা ভালো।”

“জেনে রাখলুম, বাঁচলুম। অনেক অধ্যাপক দেখেছি, তাঁদের মুখ থেকে হাসি বের করতে ডাক্তার ডাকতে হয়।”

“বাহবা, আমারই দলের লোক দেখছি তুমি। তা হলে এবার আসল কথাটা পাড়া হোক।”

“জানেন বোধ হয়, জীবনে আমার স্বামীর ল্যাবরেটরিই ছিল একমাত্র আনন্দ। আমার ছেলে নেই, ঐ ল্যাবরেটরিতে বসিয়ে দেব বলে ছেলে খুঁজছি। কানে এসেছে রেবতী ভট্টাচার্যের কথা।”

অধ্যাপক বললেন, “যোগ্য ছেলেই বটে। তার যে-লাইনের বিছে সেটাকে শেষ পর্যন্ত চালান করতে মালমসলা কম লাগবে না।”

সোহিনী বললে, “আমার রাশকরা টাকায় ছাতা পড়ে যাচ্ছে। আমার বয়সের বিধবা মেয়েরা ঠাকুরদেবতার দালালদের দালালি দিয়ে পরকালের দরজা ফাঁক করে নিতে চায়। আপনি শুনে হয়তো রাগ করবেন, আমি ও-সব কিছুই বিশ্বাস করি নে।”

চৌধুরী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, “তুমি তবে কী মানো।”

“মানুষের মতো মানুষ যদি পাই, তবে তার সব পাওনা শোধ করে দিতে চাই যতদূর আমার সাধ্য আছে। এই আমার ধর্মকর্ম।”

চৌধুরী বললেন, “হুররে। শিলা ভাসে জলে। মেয়েদের মধ্যেও দৈবাৎ কোথাও কোথাও বুদ্ধির প্রমাণ মেলে দেখছি। আমার একটি বি. এস্‌সি. বোকা আছে, সেদিন হঠাৎ দেখি, গুরুর পা ছুঁয়ে সে উলটো ডিগবাজি খেলতে লেগেছে, মগজ থেকে বুদ্ধি যাচ্ছে উড়ে ফাটা শিমুলের তুলোর মতো। তা তোমার বাড়িতেই ওকে ল্যাবরেটরিতে বসিয়ে দিতে চাও? তফাতে আর কোথাও হলে হয় না?”

“চৌধুরীমশায়, আপনি ভুল করবেন না, আমি মেয়েমানুষ। এই-খানেই এই ল্যাবরেটরিতেই হয়েছে আমার স্বামীর সাধনা। তাঁর ঐ বেদির তলায় কোনো একজন যোগ্য লোককে বাতি জ্বালিয়ে রাখবার

জন্যে যদি বসিয়ে দিতে পারি, তা হলে যেখানে থাকুন তাঁর মন খুশি হবে।"

চৌধুরী বললেন, "বাই জোভ, এতক্ষণে মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। শুনতে খারাপ লাগল না। একটা কথা জেনে রেখো, রেবতীকে যদি শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি সাহায্য করতে চাও তা হলে লাখটাকারও লাইন পেরিয়ে যাবে।"

"গেলেও আমার খুদকুঁড়ো কিছু বাকি থাকবে।"

"কিন্তু পরলোকে যাঁকে খুশি করতে চাও তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে না তো? শুনেছি তাঁরা ইচ্ছা করলে ঘাড়ে চড়ে লাফালাফি করতে পারেন।"

"আপনি খবরের কাগজ পড়েন তো। মানুষ মারা গেলেই তার গুণাবলী প্যারাগ্রাফে প্যারাগ্রাফে ছাপিয়ে পড়তে থাকে। সেই মৃত মানুষের বদান্যতার 'পরে ভরসা করলে তো দোষ নেই। টাকা যে মানুষ জমিয়েছে অনেক পাপ জমিয়েছে সে তার সঙ্গে, আমরা কী করতে আছি, যদি থলি ঝেড়ে স্বামীর পাপ হালকা করতে না পারি। যাক্‌গে টাকা, আমার টাকায় দরকার নেই।"

অধ্যাপক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, "কী আর বলব তোমাকে। খনি থেকে সোনা ওঠে, সে খাঁটি সোনা, যদিও তাতে মিশোল থাকে অনেক কিছু। তুমি সেই ছদ্মবেশী সোনার ঢেলা। চিনেছি তোমাকে। এখন কী করতে হবে বলো।"

"ঐ ছেলেটিকে রাজী করিয়ে দিন।"

"চেষ্টা করব, কিন্তু কাজটা খুব সহজ নয়। আর-কেউ হলে তোমার দান লাফিয়ে নিত।"

"কোথায় বাধছে বলুন।"

"শিশুকাল থেকে একটি মেয়ে-গ্রহ ওর কুষ্টি দখল করে বসেছে। রাস্তা আগলে রয়েছে অটল অবুদ্ধি।"

"বলেন কী। পুরুষমানুষ—"

"দেখো মিসেস মল্লিক, রাগ করবে কাকে নিয়ে। জানো মেট্রিয়ার্কাল সমাজ কাকে বলে? যে সমাজের মেয়েরাই হচ্ছে পুরুষের সেরা। এক সময়ে সেই দ্রাবিড়ি সমাজের ঢেউ বাংলাদেশে খেলত।"

সোহিনী বললে, "সে সুদিন তো গেছে। তলায় তলায় ঢেউ খেলে হয়তো, ঘুলিয়ে দেয় বুদ্ধিসুদ্ধি, কিন্তু হাল যে একলা পুরুষের হাতে। কানে মন্ত্র দেন তাঁরাই, আর জোরে দেন কানমলা। কান ছিঁড়ে যাবার জো হয়।"

"আহা হা, কথা কইতে জানো তুমি। তোমার মতো মেয়েদের যুগ যদি আসে তা হলে মেট্রিয়ার্কাল সমাজে ধোবার বাড়ির ফর্দ রাখি মেয়েদের শাড়ির, আর আমাদের কলেজের প্রিন্সিপল্‌কে পাঠিয়ে দিই ঢেঁকি কুটতে। মনোবিজ্ঞান বলে, বাংলাদেশে মেট্রিয়ার্কি বাইরে নেই, আছে নাড়ীতে। মা মা শব্দে হাম্বাধ্বনি আর-কোনো দেশের পুরুষমহলে শুনেছ কি। তোমাকে খবর দিচ্ছি, রেবতীর বুদ্ধির ডগার উপরে চড়ে বসে আছে একটি রীতিমত মেয়ে।"

"কাউকে ভালোবাসে নাকি।"

"আহা, সেটা হলে তো বুঝতুম, ওর শিরায় প্রাণ করছে ধুকধুক। যুবতীর হাতে বুদ্ধি খোয়াবার বায়না নিয়েই তো এসেছে, এই তো সেই বয়েস। তা না হয়ে এই কাঁচা বয়সে ও যে এক মালা-জপকারিণীর হাতে মালার গুটি বনে গেছে। ওকে বাঁচাবে কিসে—না যৌবন, না বুদ্ধি, না বিজ্ঞান।"

"আচ্ছা, একদিন ওঁকে এখানে চা খেতে ডাকতে পারি কি। আমাদের মতো অশুচির ঘরে খাবেন তো?"

"অশুচি! না খায় তো ওকে আছড়ে আছড়ে এমনি শুচি করে নেব যে বামনাইয়ের দাগ থাকবে না ওর মজ্জায়। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার নাকি একটি সুন্দরী মেয়ে আছে।"

"আছে। পোড়াকপালী সুন্দরীও বটে। তা কী করব বলুন।"

"না না, আমাকে ভুল কোরো না। আমার কথা যদি বলো,

সুন্দরী মেয়ে আমি পছন্দই করি। ওটা আমার একটা রোগ বললেই হয়। কিন্তু ওর আত্মীয়েরা বেরসিক, ভয় পেয়ে যাবে।"

"ভয় নেই, আমি নিজের জাতেই মেয়ের বিয়ে দেব ঠিক করেছি।"

এটা একেবারে বানানো কথা।

"তুমি নিজে তো বেজাতে বিয়ে করেছ।"

"নাকাল হয়েছি কম নয়। বিষয়ের দখল নিয়ে মামলা করতে হয়েছে বিস্তর। যে করে জিতেছি সেটা বলবার কথা নয়।"

"শুনেছি কিছু কিছু। বিপক্ষ পক্ষের আর্টিকেল্‌ড ক্লার্ককে নিয়ে তোমার নামে গুজব রটেছিল। মকদ্দমায় জিতে তুমি তো সরে পড়লে, সে লোকটা গলায় দড়ি দিয়ে মরতে যায় আর কি।"

"এত যুগ ধরে মেয়েমানুষ টিঁকে আছে কী ক'রে। ছল করার কম কৌশল লাগে না, লড়াইয়ের তাগবাগের সমানই সে, তবে কিনা তাতে মধুও কিছু খরচ করতে হয়। এ হল নারীর স্বভাবদত্ত লড়াইয়ের রীতি।"

"ঐ দেখো, আবার তুমি আমাকে ভুল করছ। আমরা বিজ্ঞানী, আমরা বিচারক নই, স্বভাবের খেলা আমরা নিষ্কাম ভাবে দেখে যাই। সে খেলায় যা ফল হবার তা ফলতে থাকে। তোমার বেলায় ফলটা বেশ হিসেবমতই ফলেছিল, বলেছিলুম, ধন্য মেয়ে তুমি। এ কথাটাও ভেবেছি, আমি যে তখন প্রোফেসর ছিলুম, আর্টিকেল্‌ড ক্লার্ক ছিলুম না, সেটা আমার বাঁচোয়া। মার্করি সূর্যের কাছ থেকে যতটুকু দূরে আছে ততটুকু দূরে থেকেই বেঁচে গেল। ওটা গণিতের হিসাবের কথা, ওতে ভালো নেই মন্দ নেই। এসব কথা বোধ হয় তুমি বুঝতে শিখেছ।"

"তা শিখেছি। গ্রহগুলো টান মেনে চলে আবার টান এড়িয়ে চলে—এটা একটা শিখে নেবার তত্ত্ব বৈকি।"

"আর-একটা কথা কবুল করছি। এইমাত্র তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে একটা হিসেব মনে মনে কষছিলুম, সেও অঙ্কের

হিসেব। ভেবে দেখো, বয়সটা যদি অন্তত দশটা বছর কম হত তা হলে খামকা আজ একটা বিপদ ঘটত। কোলিশন ঐটুকু পাশ কাটিয়ে গেল আর কি। তবু বাষ্পের জোয়ার উঠছে বুকের মধ্যে। ভেবে দেখো, সৃষ্টিটা আগাগোড়াই কেবল অঙ্ককষার খেলা।”

এই বলে চৌধুরী দুই হাঁটু চাপড়িয়ে হা হা করে হেসে উঠলেন। একটা কথা তাঁর হুঁশ ছিল না যে, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার আগে সোহিনী দু ঘণ্টা ধরে রঙেচঙে এমন করে বয়স বদল করেছে যে সৃষ্টিকর্তাকে আগাগোড়াই দিয়েছে ঠকিয়ে।

৪

পরের দিন অধ্যাপক এসে দেখলেন সোহিনী রোঁয়াওঠা হাড়-বের-করা একটা কুকুরকে স্নান করিয়ে তোয়ালে দিয়ে তার গা মুছিয়ে দিচ্ছে।

চৌধুরী জিগ্‌গেসা করলেন, “এই অপয়মন্তটাকে এত সম্মান কেন।”

“ওকে বাঁচিয়েছি বলে। পা ভেঙেছিল মোটরের তলায় পড়ে, আমি সারিয়ে তুলেছি ব্যাণ্ডেজ বেঁধে। এখন ওর প্রাণটার মধ্যে আমারও শেয়ার আছে।”

“রোজ রোজ ঐ অলুক্ষুনের চেহারা দেখে মন খারাপ হয়ে যাবে না?”

“চেহারা দেখবার জন্যে ওকে তো রাখি নি। মরতে মরতে এই যে ও সেরে উঠেছে, এটা দেখতে আমার ভালো লাগে। ঐ প্রাণীর বেঁচে থাকবার দরকারটা যখন দিনে দিনে মিটিয়ে দিই, তখন ধর্মকর্ম করতে ছাগলছানার গলায় দড়ি বেঁধে আমাকে কালীতলায় দৌড়তে হয় না। তোমাদের বায়োলজির ল্যাবরেটরির কানাখোঁড়া কুকুর-খরগোশগুলোর জন্যে আমি একটা হাসপাতাল বানাব স্থির করেছি।”

"মিসেস মল্লিক, তোমাকে যতই দেখছি তাক লাগছে।"

"আরো বেশি দেখলে ওটার উপশম হবে। রেবতীবাবুর খবর দেবেন বলেছিলেন, সেটা আরম্ভ করে দিন।"

"আমার সঙ্গে দূর সম্পর্কে ওদের যোগ আছে। তাই ওদের ঘরের খবর জানি। রেবতীকে জন্ম দিয়েই ওর মা যান মারা। বরাবর ও পিসির হাতে মানুষ। ওর পিসির আচারনিষ্ঠা একেবারে নিরেট। এতটুকু খুঁত নিয়ে ওঁর খুঁতখুঁতুনি সংসারকে অতিষ্ঠ করে তুলত। তাঁকে ভয় না করত এমন লোক ছিল না পরিবারে। ওঁর হাতে রেবতীর পৌরুষ গেল ছাতু হয়ে। স্কুল থেকে ফিরতে পাঁচ মিনিট দেরি হলে পঁচিশ মিনিট লাগত তার জবাবদিহি করতে।"

সোহিনী বললে, "আমি তো জানি পুরুষরা করবে শাসন, মেয়েরা দেবে আদর, তবেই ওজন ঠিক থাকে।"

অধ্যাপক বললেন, "ওজন ঠিক রেখে চলা মরালগামিনীদের ধাতে নেই। ওরা এ দিকে ঝুঁকবে ও দিকে ঝুঁকবে। কিছু মনে কোরো না মিসেস মল্লিক, ওদের মধ্যেও দৈবাৎ মেলে যারা খাড়া রাখে মাথা, চলে সোজা চালে। যেমন—"

"আর বলতে হবে না। কিন্তু আমার মধ্যেও শিকড়ের দিকে মেয়েমানুষ যথেষ্ট আছে। কী ঝোঁকে পেয়েছে দেখছেন না! ছেলে-ধরা ঝোঁক। নইলে আপনাকে বিরক্ত করতেম কি।"

"দেখো, বার বার ঐ কথাটা বোলো না। জেনে রেখো আজ ক্লাসের জন্যে তৈরি না হয়েই চলে এসেছি। কর্তব্যের গাফেলি এতই ভালো লাগছে।"

"বোধ হয় মেয়েজাতটার 'পরেই আপনার বিশেষ একটু কৃপা আছে।"

"একটুও অসম্ভব নয়। কিন্তু তার মধ্যেও তো ইতরবিশেষ আছে। যা হোক, সে কথাটা পরে হবে।"

সোহিনী হেসে বললে, "পরে না হলেও চলবে। আপাতত যে-

কথাটা উঠেছে শেষ করে দিন। রেবতীবাবুর এত উন্নতি হল কী করে।”

“যা হতে পারত তার তুলনায় কিছুই হয় নি। একটা রিসার্চের কাজে ওর বিশেষ দরকার হয়েছিল উঁচু পাহাড়ে যাবার। ঠিক করেছিল যাবে বদরিকাশ্রমে। আরে সর্বনাশ। পিসিরও ছিল এক পিসি, সে বুড়ি মরবে তো মরুক ঐ বদরিকারই রাস্তায়। পিসি বললে, ‘আমি যতদিন বেঁচে আছি পাহাড় পর্বত চলবে না।’ কাজেই তখন থেকে একমনে যা কামনা করছি সে মুখ ফুটে বলবার নয়। থাক্ সে কথা।”

“কিন্তু শুধু পিসিমাদের দোষ দিলে চলবে কেন। মায়ের দুলাল ভাইপোদের হাড় বুঝি কোনো কালে পাকবে না?”

“সে তো পূর্বেই বলেছি। মেট্রিয়ার্কি রক্তের মধ্যে হাম্বাধ্বনি জাগিয়ে তোলে, হতবুদ্ধি হয়ে যায় বৎসরা। আফসোসের কথা কী আর বলব। এ তো হল নম্বর ওয়ান। তার পরে রেবতী যখন সরকারের বৃত্তি নিয়ে কেম্‌ব্রিজে যাবে স্থির হল, আবার এসে পড়ল সেই পিসিমা হাউ হাউ শব্দে। তার বিশ্বাস, ও চলেছে মেমসাহেব বিয়ে করতে। আমি বললুম, না-হয় করল বিয়ে। সর্বনাশ, কথাটা আন্দাজে ছিল, এবার যেন পাকা-দেখা হয়ে গেল। পিসি বললে, ‘ছেলে যদি বিলেতে যায় তা হলে গলায় দড়ি দিয়ে মরব।’ কোন্ দেবতার দোহাই পাড়লে পাকানো হবে দড়িটা নাস্তিক আমি জানি নে, তাই দড়িটা বাজারে মিলল না। রেবতীকে খুব খানিকটা গাল দিলুম, বললুম স্টুপিড, বললুম ডান্স, বললুম ইম্‌বেসীল। ব্যস, ঐখানেই খতম। রেবু এখন ভারতীয় ঘানিতে ফোঁটা ফোঁটা তেল বের করছেন।”

সোহিনী অস্থির হয়ে বলে উঠল, “দেয়ালে মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে করছে। একটা মেয়ে রেবতীকে তলিয়ে দিয়েছে, আর-একটা মেয়ে তাকে টেনে তুলবে ডাঙায়, এই আমার পণ রইল।”

“পষ্ট কথা বলি ম্যাডাম। জানোয়ারগুলোকে শিঙে ধরে তলিয়ে দেবার হাত তোমার পাকা— লেজে ধরে তাদের উপরে তোলবার হাত তেমন দুরস্ত হয় নি। তা এখন থেকে অভ্যাসটা শুরু হোক। একটা

কথা জিজ্ঞাসা করি, সায়ান্সে এত উৎসাহ তোমার এল কোথা থেকে।"

"সকলরকম সায়েন্সেই সারা জীবন আমার স্বামীর মন ছিল মেতে। তাঁর নেশা ছিল বর্মা চুরুট আর ল্যাবরেটরি। আমাকে চুরুট ধরিয়ে প্রায় বর্মিজ মেয়ে বানিয়ে তুলেছিলেন। ছেড়ে দিলুম, দেখলুম পুরুষদের চোখে খটকা লাগে। তাঁর আর-এক নেশা আমার উপর দিয়ে জমিয়েছিলেন। পুরুষরা মেয়েদের মজায় বোকা বানিয়ে, উনি আমাকে মজিয়েছিলেন বিদ্যে দিয়ে দিনরাত। দেখুন চৌধুরীমশায়, স্বামীর দুর্বলতা স্ত্রীর কাছে ঢাকা থাকে না—কিন্তু আমি ওঁর মধ্যে কোনোখানে খাদ দেখতে পাই নি। কাছে থেকে যখন দেখতুম, দেখেছি উনি বড়ো; আজ দূরে থেকে দেখছি, দেখি উনি আরো বড়ো।"

চৌধুরী জিগ্‌গেসা করলেন, "কোন্‌খানে সব চেয়ে তাঁকে বড়ো ঠেকেছে।"

"বলব ? উনি বিদ্বান বলে নয়। বিদ্যার 'পরে ওঁর নিষ্কাম ভক্তি ছিল বলে। উনি একটা পুজোর আলো পুজোর হাওয়ার মধ্যে ছিলেন। আমরা মেয়েরা দেখবার-ছোঁবার মতো জিনিস না পেলে পুজো করবার থই পাই নে। তাঁর এই ল্যাবরেটরি আমার পুজোর দেবতা হয়েছে। ইচ্ছে করে এখানে মাঝে মাঝে ধূপধুনো জ্বালিয়ে শাঁখঘণ্টা বাজাই। ভয় করি আমার স্বামীর ঘৃণাকে। তাঁর দৈনিক যখন পুজো ছিল, এই-সব যন্ত্রতন্ত্র ঘিরে জমত কলেজের ছাত্রেরা, শিক্ষা নিত তাঁর কাছ থেকে, আর আমিও বসে যেতুম।"

"ছেলেগুলো সায়ান্সে মন দিতে পারত কি।"

"যারা পারত তাদেরই বাছাই হয়ে যেত। এমন-সব ছেলে দেখেছি যারা সত্যকার বৈরাগী। আবার দেখেছি কেউ কেউ নোট নেবার ছলে একেবারে পাশের ঠিকানায় চিঠি লিখে সাহিত্যচর্চা করত।"

"কেমন লাগত ?"

"সত্যি কথা বলব ? খারাপ লাগত না। স্বামী চলে যেতেন কাজে, ভাবুকদের মন আশেপাশে ঘুর ঘুর করত।"

"কিছু মনে কোরো না, আমি সাইকলজি স্টাডি করে থাকি। জিগ্‌গেসা করি, ওরা কিছু ফল পেত কি।"

"বলতে ইচ্ছে করে না, নোংরা আমি। দু-চারজনের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে যাদের কথা মনে পড়লে আজও মনের মধ্যে মুচড়িয়ে ধরে।"

"দু-চারজন ?"

"মন যে লোভী, মাংসমজ্জার নীচে লোভের চাপা আগুন সে লুকিয়ে রেখে দেয়, খোঁচা পেলে জ্বলে ওঠে। আমি তো গোড়াতেই নাম ডুবিয়েছি, সত্যি কথা বলতে আমার বাধে না। আজন্ম তপস্বিনী নই আমরা। ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের। দ্রৌপদী কুন্তীদের সেজে বসতে হয় সীতা সাবিত্রী। একটা কথা বলি আপনাকে চৌধুরীমশায়, মনে রাখবেন—ছেলেবেলা থেকে ভালোমন্দ-বোধ আমার স্পষ্ট ছিল না। কোনো গুরু আমায় তা শিক্ষা দেন নি। তাই মন্দের মাঝে আমি ঝাঁপ দিয়েছি সহজে—পারও হয়ে গেছি সহজে। গায়ে আমার দাগ লেগেছে কিন্তু মনে ছাপ লাগে নি। কিছু আমাকে আঁকড়ে ধরতে পারে নি। যাই হোক, তিনি যাবার পথে তাঁর চিতার আগুনে আমার আসক্তিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন, জমা পাপ একে একে জ্বলে যাচ্ছে। এই ল্যাবরেটরিতেই জ্বলছে সেই হোমের আগুন।"

"ব্র্যাভো, সত্যি কথা বলতে কী সাহস তোমার।"

"সত্যি কথা বলিয়ে নেবার লোক থাকলে বলা সহজ হয়। আপনি যে খুব সহজ, খুব সত্যি।"

"দেখো, ঐ যে চিঠিলিখিয়ে ছেলেগুলো তোমার প্রসাদ পেয়েছিল, তারা কি এখনো আনাগোনা করে।"

"সেই করেই তো তারা মুছে দিয়েছে আমার মনের ময়লা। দেখলুম, জুটছে তারা আমার চেকবইয়ের দিকে লক্ষ্য করে। ভেবেছিল মেয়েমানুষের মোহ মরতে চায় না, ভালোবাসার সিঁধের গর্ত দিয়ে পৌঁছবে তাদের হাত আমার টাকার সিন্দুকে। এত রস আমার নেই, তারা তা জানত না। আমার শুকনো পাঞ্জাবি মন। আমি সমাজের আইনকানুন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে পড়ে, কিন্তু প্রাণ গেলেও বেইমানি করতে পারব না। আমার ল্যাবরেটরির এক পয়সাও তারা খসাতে পারে নি। আমার প্রাণ শক্ত পাথর হয়ে চেপে আছে আমার দেবতার ভাণ্ডারের দ্বার। ওদের সাধ্য নেই সে পাথর গলাবে। আমাকে যিনি বেছে এনেছিলেন তিনি ভুল করেন নি।"

"তাঁকে আমি প্রণাম করি, আর পাই যদি সেই ছেলেগুলোর কান মলে দিই।"

বিদায় নেবার আগে অধ্যাপক একবার ল্যাবরেটরিটা ঘুরে এলেন সোহিনীকে সঙ্গে নিয়ে। বললেন, "এইখানেই মেয়েলিবুদ্ধির চোলাই হয়ে গেছে, অপদেবতার গাদ গেছে নেমে, বেরিয়ে এসেছে খাঁটি স্পিরিট।"

সোহিনী বললে, "যা বলুন, মন থেকে ভয় যায় না। মেয়েলিবুদ্ধি বিধাতার আদি সৃষ্টি। যখন বয়স অল্প থাকে, মনের জোর থাকে, তখন সে লুকিয়ে থাকে ঝোপেঝাপে, যেই রক্ত আসে ঠাণ্ডা হয়ে, বেরিয়ে আসেন সনাতনী পিসিমা। তার আগেই আমার মরবার ইচ্ছে রইল।"

অধ্যাপক বললেন, "ভয় নেই তোমার, আমি বলছি তুমি সজ্ঞানে মরবে।"

৫

সাদা শাড়ি পরে মাথায় কাঁচাপাকা চুলে পাউডার মেখে সোহিনী মুখের উপর একটা শুচি সাত্ত্বিক আভা মেজে তুললে। মেয়েকে

নিয়ে মোটরলঞ্চে করে উপস্থিত হল বোটানিকালে। তাকে পরিয়েছে নীলচে সবুজ বেনারসী শাড়ি, ভিতর থেকে দেখা যায় বসন্তী রঙের কাঁচুলি। কপালে তার কুঙ্কুমের ফোঁটা, সূক্ষ্ম একটু কাজলের রেখা চোখে, কাঁধের কাছে ঝুলেপড়া গুচ্ছকরা খোঁপা, পায়ে কালো চামড়ার 'পরে লাল মখমলের কাজকরা স্যাণ্ডেল।

যে আকাশনিম-বীথিকার তলায় রেবতী রবিবার কাটায় আগে থাকতে সংবাদ নিয়ে সোহিনী সেইখানেই এসে তাকে ধরলে। প্রণাম করলে একেবারে তার পায়ে মাথা রেখে। বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠল রেবতী।

সোহিনী বললে, "কিছু মনে কোরো না বাবা, তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমি ছত্রির মেয়ে। চৌধুরীমশায়ের কাছে আমার কথা শুনে থাকবে।"

"শুনেছি। কিন্তু এখানে আপনাকে বসাব কোথায়।"

"এই-যে রয়েছে সবুজ তাজা ঘাস, এমন আসন কোথায় পাওয়া যায়। ভাবছ বোধ হয়, এখানে আমি কী করতে এসেছি। এসেছি আমার ব্রত উদ্‌যাপন করতে। তোমার মতো ব্রাহ্মণ তো খুঁজে পাব না।"

রেবতী আশ্চর্য হয়ে বললে, "আমার মতো ব্রাহ্মণ!"

"তা না তো কী। আমার গুরু বলেছেন, এখনকার কালের সব-সেরা যে-বিদ্যা তাতেই যাঁর দখল তিনিই সেরা ব্রাহ্মণ।"

রেবতী অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "আমার বাবা করতেন যজন-যাজন, আমি মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি নে।"

"বলো কী, তুমি যে-মন্ত্র শিখেছ সেই মন্ত্রে সমস্ত জগৎ হয়েছে মানুষের বশ। তুমি ভাবছ মেয়েমানুষের মুখে এ-সব কথা এল কোথা থেকে। পেয়েছি পুরুষের মতো পুরুষের মুখ থেকে। তিনি আমার স্বামী। যেখানে তাঁর সাধনার পীঠস্থান ছিল, কথা দাও বাবা, সেখানে তোমাকে যেতে হবে।"

"কাল সকালে আমার ছুটি আছে, যাব।"

"তোমার দেখছি গাছপালার শখ। বড়ো আনন্দ হল। গাছপালার খোঁজে আমার স্বামী গিয়েছিলেন বর্মায়, আমি তাঁর সঙ্গ ছাড়ি নি।"

সঙ্গ ছাড়ে নি কিন্তু সায়ান্সের চর্চায় নয়। নিজের ভিতর থেকে যে গাদ উঠত ফুটে, স্বামীর চরিত্রের মধ্যেও সেটা অনুমান না করে থাকতে পারত না। সন্দেহের সংস্কার ছিল ওর আঁতে আঁতে। এক সময়ে নন্দকিশোরের যখন গুরুতর পীড়া হয়েছিল তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন, "মরবার একমাত্র আরাম এই যে, সেখান থেকে তুমি আমাকে খুঁজে বের করে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।"

সোহিনী বললে, "সঙ্গে যেতে পারি তো।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "সর্বনাশ!"

সোহিনী রেবতীকে বললে, "বর্মা থেকে আসবার সময় এনেছিলুম এক গাছের চারা। বর্মিজরা তাকে বলে ক্নোযাইটানিয়েঙ্গ্। চমৎকার ফুলের শোভা— কিন্তু কিছুতেই বাঁচাতে পারলুম না।"

আজই সকালে স্বামীর লাইব্রেরি ঘেঁটে এ নাম সোহিনী প্রথম বের করেছে। গাছটা চোখেও দেখে নি। বিদ্যার জাল ফেলে বিদ্বানকে টানতে চায়।

অবাক হল রেবতী। জিগ্‌গেসা করলে, "এর লাটিন নামটা কি জানেন।"

সোহিনী অনায়াসে বলে দিলে, "তাকে বলে মিলেটিয়া।"

বললে, "আমার স্বামী সহজে কিছু মানতেন না, তবু তাঁর একটা অন্ধবিশ্বাস ছিল ফলে ফুলে প্রকৃতির মধ্যে যা-কিছু আছে সুন্দর, মেয়েরা বিশেষ অবস্থায় তার দিকে একান্ত করে যদি মন রাখে তা হলে সন্তানরা সুন্দর হয়ে জন্মাবেই। এ কথা তুমি বিশ্বাস করো কি।"

বলা বাহুল্য এটা নন্দকিশোরের মত নয়।

রেবতী মাথা চুলকিয়ে বললে, "যথোচিত প্রমাণ তো এখনো জড়ো হয় নি।"

সোহিনী বললে, "অন্তত একটা প্রমাণ পেয়েছি আমার আপন ঘরেই। আমার মেয়ে এমন আশ্চর্য রূপ পেলে কোথা থেকে। বসন্তের নানা ফুলের যেন— থাক্— নিজের চোখে দেখলেই বুঝতে পারবে।"

দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল রেবতী। নাট্যের কোনো সরঞ্জাম বাকি ছিল না।

সোহিনী তার রাঁধুনী বামুনকে সাজিয়ে এনেছে পূজারী বামুনের বেশে। পরনে চেলি, কপালে ফোঁটাতিলক, টিকিতে ফুল বাঁধা, বেলের আঠায় মাজা মোটা পইতে গলায়। তাকে ডেকে বললে, "ঠাকুর, সময় তো হল, নীলুকে এবার ডেকে নিয়ে এসো।"

নীলাকে তার মা বসিয়ে রেখেছিল স্টীমলঞ্চে। ঠিক ছিল ডালি হাতে সে উঠে আসবে, বেশ খানিকখন তাকে দেখা যাবে সকাল-বেলার ছায়ায়-আলোয়।

ইতিমধ্যে রেবতীকে সোহিনী তন্ন তন্ন করে দেখে নিতে লাগল। রঙ মসৃণ শ্যামবর্ণ, একটু হলদের আভা আছে। কপাল চওড়া, চুলগুলো আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে উপরে তোলা। চোখ বড়ো নয় কিন্তু তাতে দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছ আলো জ্বল জ্বল করছে, মুখের মধ্যে সেইটেই সকলের চেয়ে চোখে পড়ে। নীচে মুখের বেড়টা মেয়েলী ধাঁচের মোলায়েম। রেবতীর সম্বন্ধে ও যত খবর জোগাড় করেছে তার মধ্যে ও বিশেষ লক্ষ করেছে একটা কথা। ছেলেবেলাকার বন্ধুদের ওর উপরে ছিল কান্নাকাটি-জড়ানো সেন্টিমেণ্টাল ভালোবাসা। ওর মুখে যে একটা তুর্বল মাধুর্য ছিল, তাতে পুরুষ বালকদের মনে মোহ আনতে পারত।

সোহিনীর মনে খটকা লাগল। ওর বিশ্বাস, মেয়েদের মনকে নোঙরের মতো শক্ত করে আঁকড়ে ধরার জন্যে পুরুষের ভালো দেখতে হওয়ার দরকারই করে না। বুদ্ধিবিদ্যেটাও গৌণ। আসল দরকার পৌরুষের ম্যাগ্‌নেটিজিম। সেটা তার স্নায়ুর পেশীর ভিতরকার বেতার-

বার্তার মতো। প্রকাশ পেতে থাকে কামনার অকথিত স্পর্ধারূপে।

মনে পড়ল, নিজের প্রথম বয়সের রসোন্মত্ততার ইতিহাস। ও যাকে টেনেছিল কিংবা যে টেনেছিল ওকে, তার না ছিল রূপ, না ছিল বিদ্যা, না ছিল বংশগৌরব। কিন্তু কী একটা অদৃশ্য তাপের বিকিরণ ছিল যার অলক্ষ্য সংস্পর্শে সমস্ত দেহ মন দিয়ে ও তাকে অত্যন্ত করে অনুভব করেছিল পুরুষমানুষ বলে। নীলার জীবনে কখন এক সময়ে সেই অনিবার্য আলোড়নের আরম্ভ হবে এই ভাবনা তাকে স্থির থাকতে দিত না। যৌবনের শেষ দশাই সকলের চেয়ে বিপদের দশা, সেই সময়টাতে সোহিনীকে অনেকখানি ভুলিয়ে রেখেছিল নিরবকাশ জ্ঞানের চর্চায়। কিন্তু দৈবাৎ সোহিনীর মনের জমি ছিল স্বভাবত উর্বরা। কিন্তু যে-জ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক, সব মেয়ের তার প্রতি টান থাকে না। নীলার মনে আলো পৌঁছয় না। নদীর ঘাট থেকে আস্তে আস্তে দেখা দিল নীলা। রোদ্দুর পড়েছে তার কপালে তার চুলে, বেনারসী শাড়ির উপরে জরির রশ্মি ঝলমল করে উঠছে। রেবতীর দৃষ্টি এক মুহূর্তের মধ্যে ওকে ব্যাপ্ত করে দেখে নিলে। চোখ নামিয়ে নিল পরক্ষণেই। ছেলেবেলা থেকে তার এই শিক্ষা। যে সুন্দরী মেয়ে মহামায়ার মনোহারিণী লীলা, তাকে আড়াল করে রেখেছে পিসির তর্জনী। তাই যখন সুযোগ ঘটে তখন দৃষ্টির অমৃত ওকে তাড়াতাড়ি এক চুমুকে গিলতে হয়।

মনে মনে রেবতীকে ধিক্কার দিয়ে সোহিনী বললে, "দেখো দেখো, একবার চেয়ে দেখো।"

রেবতী চমকে উঠে চোখ তুলে চাইলে।

সোহিনী বললে, "দেখো তো ডক্টর অব সায়ান্স, ওর শাড়ির রঙের সঙ্গে পাতার রঙের কী চমৎকার মিল হয়েছে।"

রেবতী সসংকোচে বললে, "চমৎকার।"

সোহিনী মনে মনে বললে, 'নাঃ, আর পারা গেল না।' আবার বললে, "ভিতরে বসন্তী রঙ উঁকি মারছে, উপরে সবজে নীল। কোন্

ফুলের সঙ্গে মেলে বলো দেখি।”

উৎসাহ পেয়ে রেবতী ভালো করেই দেখলে। বললে, “একটা ফুল মনে পড়ছে কিন্তু উপরের আবরণটা ঠিক নীল নয়, ব্রাউন।”

“কোন্ ফুল বলো তো।”

রেবতী বললে, “মেলিনা।”

“ও বুঝেছি। তার পাঁচটি পাপড়ি, একটি উজ্জ্বল হলদে, বাকি চারটে শ্যামবর্ণ।”

রেবতী আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে, “এত করে ফুলের পরিচয় জানলেন কী করে।”

সোহিনী হেসে বললে, “জানা উচিত হয় নি বাবা। পুজোর সাজির বাইরের ফুল আমাদের কাছে পরপুরুষ বললেই হয়।”

ডালি হাতে এল ধীরে ধীরে নীলা। মা বললে, “জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন। পা ছুঁয়ে প্রণাম কর্।”

‘থাক্ থাক্’ বলে রেবতী অস্থির হয়ে উঠল। রেবতী আসন করে বসেছিল, পা খুঁজে বের করতে নীলাকে একটু হাতড়াতে হল। শিউরে উঠল রেবতীর সমস্ত শরীর। ডালিতে ছিল দুর্লভ-জাতীয় অর্কিডের মঞ্জরি, রুপোর থালায় ছিল বাদামের তক্তি, পেস্তার বরফি, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, মালাইয়ের বরফি, চৌকো করে কাটা কাটা ভাপা দই।

বললে, “এ-সমস্ত তৈরি নীলার নিজের হাতে।”

সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। এ-সব কাজে নীলার না ছিল হাত, না ছিল মন।

সোহিনী বললে, “একটু মুখে দিতে হয় বাবা, ঘরে তৈরি তোমারই উদ্দেশে।”

ফরমাশে তৈরি বড়োবাজারের এক চেনা দোকানে।

রেবতী হাত জোড় করে বললে, “এ সময়ে খাওয়া আমার অভ্যাস নয়। বরং অনুমতি করেন যদি বাসায় নিয়ে যাই।”

সোহিনী বললে, “সেই ভালো। অনুরোধ করে খাওয়ানো আমার

স্বামীর আইনে বারণ। তিনি বলতেন, মানুষ তো অজগরের জাত নয়।"

একটা বড়ো টিফিন ক্যারিয়ারে থাকে থাকে সোহিনী খাবার সাজিয়ে দিলে। নীলাকে বললে, "দে তো মা, সাজিতে ফুলগুলি ভালো করে সাজিয়ে। এক জাতের সঙ্গে আর-এক জাত মিশিয়ে দিস নে যেন। আর তোর খোঁপা ঘিরে ঐ যে সিল্কের রুমাল জড়িয়েছিস, ওটা পেতে দিস ফুলগুলির উপরে।"

বিজ্ঞানীর চোখে আর্টপিপাসুর দৃষ্টি উঠল উৎসুক হয়ে। এ যে প্রাকৃত জগতের মাপ-ওজনের বাইরেকার জিনিস। নানা রঙের ফুলগুলির মধ্যে নীলার সুঠাম আঙুল সাজাবার লয় রেখে নানা ভঙ্গিতে চলছিল— রেবতীর চোখ ফেরানো দায় হল। মাঝে মাঝে নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে নিচ্ছিল। একদিকে সেই মুখের সীমানা দিয়েছে চুনি-মুক্তো-পান্নার-মিশোল-করা একহারা হার জড়ানো চুলের ইন্দ্রধনু, আর একদিকে বসন্তীরঙা কাঁচুলির উচ্ছ্রিত রাঙা পাড়টি। সোহিনী মিষ্টান্ন সাজাচ্ছিল কিন্তু ওর একটা তৃতীয় নেত্র আছে যেন। সামনে যে একটা জাদু চলছিল সে ওর লক্ষ এড়ায় নি।

নিজের স্বামীর অভিজ্ঞতা অনুসারে সোহিনীর ধারণা ছিল বিদ্যা-সাধনার বেড়াদেওয়া খেত যে-সে গোরুর চরবার খেত নয়। আজ আভাস পেল বেড়া সকলের পক্ষে সমান ঘন নয়। সেটা ভালো লাগল না।

৬

পরের দিন সোহিনী অধ্যাপককে ডেকে পাঠালে। বললে, "নিজের গরজে আপনাকে ডেকে এনে মিছিমিছি কষ্ট দিই। হয়তো কাজের ক্ষতিও করি।"

"দোহাই তোমার, আরো-একটু ঘন ঘন ডেকো। দরকার থাকে

তো ভালো, না থাকে তো আরো ভালো।"

"আপনি জানেন, দামী যন্ত্র সংগ্রহের নেশায় আমার স্বামীর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকত না। মনিবদের ফাঁকি দিতেন এই নিষ্কাম লোভে। সমস্ত এশিয়ার মধ্যে এমন ল্যাবরেটরি কোথাও পাওয়া যাবে না, এই জেদ তাঁর মতো আমাকেও পেয়ে বসেছিল। এই জেদেই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, নইলে আমার ম'দো রক্ত গাঁজিয়ে উঠে উপচিয়ে পড়ত চারি দিকে। দেখুন চৌধুরীমশায়, নিজের স্বভাবের মধ্যে মন্দটা যা লেপটিয়ে থাকে সেটা যাঁর কাছে অসংকোচে বলতে পারি আপনি আমার সেই বন্ধু। নিজের কলঙ্কের দিকটা দেখবার খোলসা দরজা পেলে মন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।"

চৌধুরী বললেন, "যারা সম্পূর্ণটা দেখতে পায় তাদের কাছে সত্যকে চাপা দেবার দরকার করে না। আধা সত্যই লজ্জার জিনিস। পুরোপুরি দেখার ধাত আমাদের, আমরা বিজ্ঞানী।"

"তিনি বলতেন, মানুষ প্রাণপণে প্রাণ বাঁচাতে চায় কিন্তু প্রাণ তো বাঁচে না। সেইজন্যে বাঁচবার শখ মেটাবার জন্যে এমন-কিছুকে সে খুঁজে বেড়ায় যা প্রাণের চেয়ে অনেক বেশি। সেই দুর্লভ জিনিসকে তিনি পেয়েছেন তাঁর এই ল্যাবরেটরিতে। একে যদি আমি বাঁচিয়ে রাখতে না পারি তা হলেই তাঁকে চরম করে মারব স্বামীঘাতিনী হয়ে। আমি এর রক্ষক চাই, তাই খুঁজছিলুম রেবতীকে।"

"চেষ্টা করে দেখলে ?"

"দেখেছি হাতে হাতে ফল পাবার আশা আছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিঁকবে না।"

"কেন।"

"ওঁর পিসিমা যেমনি শুনবেন রেবতীকে টেনেছি কাছে, অমনি তাঁকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবার জন্যে ছুটে আসবেন। ভাববেন, আমার মেয়ের সঙ্গে ওঁর বিয়ে দেবার ফাঁদ পেতেছি।"

"দোষ কী, হলে তো ভালোই হত। কিন্তু তুমি যে বলেছিলে,

বে-জাতে মেয়ের বিয়ে দেবে না।”

“তখনো আপনার মন জানতুম না, তাই মিথ্যে কথা বলেছিলুম। খুবই চেয়েছিলুম। কিন্তু ছেড়েছি সেই মতলব।”

“কেন।”

“বুঝতে পেরেছি, ও ভাঙনধরানো মেয়ে। ওর হাতে যা পড়বে তা আস্ত থাকবে না।”

“কিন্তু ও তো তোমারই মেয়ে।”

“আমারই মেয়ে তো বটে, তাই তো ওকে আঁতের ভিতর থেকেই চিনি।”

অধ্যাপক বললেন, “কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে কেন যে, মেয়েরা পুরুষের ইন্‌স্পিরেশন জাগাতে পারে।”

“আমার সবই জানা আছে। পুরুষের খোরাকে আমিষ পর্যন্ত ভালোই চলে কিন্তু মদ ধরালেই সর্বনাশ। আমার মেয়েটি মদের পাত্র, কানায় কানায় ভরা।”

“তা হলে কী করতে চাও বলো।”

“আমার ল্যাবরেটরি দান করতে চাই পাবলিককে।”

“তোমার একমাত্র মেয়েকে এড়িয়ে দিয়ে?”

“মেয়েকে? ওকে দান করলে সে দান পৌঁছবে কোন্‌ রসাতলে কী করে জানব। আমার ট্রাস্ট-সম্পত্তির প্রেসিডেন্ট করে দেব রেবতীকে। তাতে তো পিসির আপত্তি হতে পারবে না?”

“মেয়েদের আপত্তির যুক্তি যদি ধরতেই পারব তা হলে পুরুষ হয়ে জন্মাতে গেলুম কেন। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি নে, ওকে যদি জামাই না করবে তা হলে প্রেসিডেন্ট করতে চাও কেন।”

“শুধু যন্ত্রগুলো নিয়ে কী হবে। মানুষ চাই ওদের প্রাণ দিতে। আর-একটা কথা এই, আমার স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে একটাও নতুন যন্ত্র আনা হয় নি। টাকার অভাবে নয়। কিনতে হলে একটা লক্ষ্য ধরে কিনতে হয়। খবর জেনেছি, রেবতী ম্যাগনেটিজ্‌ম্‌ নিয়ে কাজ

করছেন। সেই পথে সংগ্রহ এগিয়ে চলুক, যত দাম লাগে লাগুক-না।"

"কী আর বলব, পুরুষমানুষ যদি হতে তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে নেচে বেড়াতাম। তোমার স্বামী রেল কোম্পানির টাকা চুরি করেছিলেন, তুমি চুরি করে নিয়েছ তাঁর পুরুষের মনখানা। এমন অদ্ভুত কলমের জোড়লাগানো বুদ্ধি আমি কখনো দেখি নি। আমারও পরামর্শ নেওয়া তুমি যে দরকার বোধ করো, এই আশ্চর্য।"

"তার কারণ আপনি যে খুব খাঁটি, ঠিক কথা বলতে জানেন।"

"হাসালে তুমি। তোমাকে বেঠিক কথা বলে ধরা পড়ব, এত বড়ো নিরেট বোকা আমি নই।— তা হলে লাগা যাক এবার জিনিসপত্র ফর্দ করা, দর যাচাই করা, ভালো উকিল ডেকে তোমার স্বত্ব বিচার করা, আইনকানুন বেঁধে দেওয়া ইত্যাদি অনেক হাঙ্গামা আছে।"

"এ-সব দায় কিন্তু আপনারই।"

"সেটা হবে নামমাত্র'। বেশ ভালো করেই জানো, যা তুমি বলাবে তাই বলব, যা করাবে তাই করব। আমার লাভটা এই যে ত্বেলা দেখা হবে তোমার সঙ্গে। তোমাকে যে কী চক্ষে দেখেছি তুমি তো জানো না।"

সোহিনী চৌকি থেকে উঠে এসে ধাঁ করে এক হাতে চৌধুরীর গলা জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে চট করে সরে গেল, ভালোমানুষের মতো বসল গিয়ে চৌকিতে।

"ঐ রে, সর্বনাশের শুরু হল দেখছি।"

"সে ভয় যদি একটুও থাকত তা হলে কাছেও এগতুম না। এ বরাদ্দ আপনার জুটবে মাঝে মাঝে।"

"ঠিক বলছ?"

"ঠিকই বলছি। আমার এতে খরচ নেই, আপনারও যে বেশি কিছু পাওনা আছে, মুখের ভাব দেখে তা বোধ হচ্ছে না।"

"অর্থাৎ বলতে চাও, এ হচ্ছে মরা কাঠে কাঠঠোকরার ঠোকর দেওয়া।— চললুম উকিলবাড়িতে।"

"কাল একবার আসবেন এ পাড়াতে।"

"কেন, কী করতে।"

"রেবতীর মনে দম দিতে।"

"আর নিজের মনটা খুইয়ে বসতে।"

"মন কি আপনার একলারই আছে।"

"তোমার মনের কিছু বাকি আছে নাকি।"

"উচ্ছিষ্ট অনেক পড়ে আছে।"

"তাতে এখনো অনেক বাঁদর নাচানো চলবে।"

৭

তার পরদিনে রেবতী ল্যাবরেটরিতে নির্দিষ্ট সময়ের অন্তত বিশ মিনিট আগে এসেই উপস্থিত। সোহিনী প্রস্তুত ছিল না, আটপৌরে কাপড়েই তাড়াতাড়ি চলে এল ঘরে। রেবতী বুঝতে পারলে গলদ হয়েছে। বললে, "আমার ঘড়িটা ঠিক চলছে না দেখছি।" সোহিনী সংক্ষেপে বললে, "নিশ্চয়।" এক সময়ে একটু কী শব্দ শুনে রেবতী মনে মনে চমকে উঠে দরজার দিকে তাকালে। সুখন বেহারাটা গ্লাসকেসের চাবি নিয়ে এল ঘরে।

সোহিনী জিগ্‌গেসা করলে, "এক পেয়ালা চা আনিয়ে দেব কি।"

রেবতী ভাবলে বলা উচিত, হাঁ। বললে, "দোষ কী।"

ও বেচারার চা অভ্যাস নেই, সর্দির আভাস দিলে বেলপাতা-সিদ্ধ গরম জল খেয়ে থাকে। মনে মনে বিশ্বাস ছিল স্বয়ং নীলা আসবে পেয়ালা হাতে।

সোহিনী জিগ্‌গেসা করলে, "তুমি কি কড়া চা খাও।"

ও ফস্‌ করে বলে বসল, "হাঁ।"

ভাবলে এ ক্ষেত্রে হাঁ বলাটাই পাকা দস্তুর। এল চা, সেটা কড়া সন্দেহ নেই। কালির মতো রঙ, নিমের মতো তিতো। চা আনলে

মুসলমান খানসামা। এটাও ওকে পরীক্ষা করবার জন্যে। আপত্তি করতে ওর মুখে কথা সরল না। এই সংকোচ ভালো লাগল না সোহিনীর। খানসামাকে বললে, "চা-টা ঢেলে দাও-না মোবারক, ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।"

খানসামার হাতের পরিবেশন-প্রত্যাশায় রেবতী বিশ মিনিট আগে এখানে আসে নি।

কী দুঃখে যে মুখে চামচ উঠছিল অন্তর্যামীই জানছিলেন, আর জানছিল সোহিনী। হাজার হোক মেয়েমানুষ, দুর্গতি দেখে বললে, "ও পেয়ালাটা থাক্। দুধ ঢেলে দিচ্ছি, তার সঙ্গে কিছু ফল খেয়ে নাও। সকাল সকাল এসেছ, বোধ হয় কিছু খেয়ে আসা হয় নি।" কথাটা সত্য। রেবতী ভেবেছিল আজও সেই বোটানিকালের পুনরাবৃত্তি হবে। কাছ দিয়েও গেল না, মুখে রয়ে গেল কড়া চায়ের তিতো স্বাদ আর মনে রয়েছে আশাভঙ্গের তিতো অভিজ্ঞতা।

এমন সময় প্রবেশ করলেন অধ্যাপক। ঘরে ঢুকেই রেবতীর পিঠ চাপড়িয়ে বললেন, "কীরে হল কী, সব যে একেবারে ঠাণ্ডা হিম। খুকুর মতো বসে বসে দুধ খাচ্ছিস ঢকে ঢক। চারি দিকে যা দেখছিস একি খোকাবাবুর খেলনার দোকান। যাদের চোখ আছে তারা দেখেছে, মহাকালের চেলারা এইখানে আসে তাণ্ডবনৃত্য করতে।"

"আহা কেন বকছেন। না খেয়েই ও বেরিয়েছিল আজ সকালে। এল যখন, তখন দেখলুম মুখ যেন শুকনো।"

"ঐরে পিসিমা দি সেকেণ্ড। এক পিসিমা দেবে এক গালে চাপড়, আর-এক পিসিমা দেবে অন্য গালে চুমো। মাঝখানে পড়ে ছেলেটা যাবে ভিজে কাদা হয়ে। আসল কথা কী জানো, লক্ষ্মী যখন আপনি সেধে আসেন চোখে পড়েন না; যারা সাত মুল্লুক ঘুরে তাঁকে খুঁজে বের করে, ধরা দেন তিনি তাদেরই কাছে। না-চেয়ে পাওয়ার মতো না-পাওয়ার আর রাস্তা নেই। আচ্ছা বলো দেখি মিসেস—দূর হোকগে ছাই মিসেস—আমি ডাকবই তোমাকে সোহিনী বলে, এতে

তুমি রাগই করো আর যাই করো।”

“মরণ আমার, রাগ করতে যাব কেন। ডাকুন আমাকে সোহিনী বলে, সুহি বললে আমার কান জুড়িয়ে যাবে।”

“গোপন কথাটা প্রকাশ করেই বলি। তোমার ঐ সোহিনী নামটির সঙ্গে আর-একটি শব্দের মিল আছে, বড়ো খাঁটি তার অর্থ। সকালে ঘুম থেকে উঠেই হিনি হিনি কিনি কিনি রবে ঐ দুটি শব্দ মিলিয়ে মনে মনে খঞ্জনি বাজাতে থাকি।”

“কেমিস্ট্রির রিসর্চে মিল করা আপনার অভ্যাস আছে, ওটা তারই একটা ফেঁকড়া।”

“মিল করতে গিয়ে মরেও অনেক লোক। বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে নেই—ঘোরতর দাহ্য পদার্থ।”

এই বলে হাঃ হাঃ শব্দে উচ্চহাস্য করে উঠলেন।

“নাঃ, ঐ ছোকরাটার সামনে এ-সব কথার আলোচনা করতে নেই। বারুদের কারখানায় আজ পর্যন্ত ও অ্যাপ্রেণ্টিসি শুরু করে নি। পিসিমার আঁচল ওকে আগলে আছে, সে আঁচল নন্‌কম্‌বাস্টিবল।”

রেবতীর মেয়েলী মুখ লাল হয়ে উঠছিল।

“সোহিনী, আমি তোমাকে জিগ্‌গেসা করতে যাচ্ছিলুম, আজ সকালে তুমি কি ওকে আফিম খাইয়ে দিয়েছিলে। অমন ঝিমিয়ে পড়ছে কেন।”

“খাইয়ে যদি থাকি সেটা না জেনে।”

“রেবু, ওঠ্‌ বলছি ওঠ্‌। মেয়েদের কাছে অমন মুখচোরা হয়ে থাকতে নেই। ওতে ওদের আস্পর্ধা বেড়ে যায়। ওরা তো ব্যামোর মতো পুরুষের দুর্বলতা খুঁজে বেড়ায়, ছিদ্র পেলেই টেম্পেরেচর চড়িয়ে দেয় হু হু ক'রে। সাবজেক্টটা জানা আছে, ছেলেগুলোকে সাবধান করতে হয়। আমার মতো যারা ঘা খেয়েছে, মরে নি, তাদের কাছ থেকেই পাঠ নিতে হয়। রেবু, কিছু মনে করিস নে বাবা। যারা কথা কয় না, চুপ করে থাকে, তারাই সব চেয়ে ভয়ংকর। চল্‌ দেখি,

তোকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। ঐ দেখ্ দুটো গ্যালভানোমিটর, একেবারে হাল কায়দার। এই দেখ্ হাই ভ্যাকুয়ম পম্প, আর এটা মাইক্রোফোটোমিটর, এ ছেলে-পাসকরাবার কলার ভেলা নয়। একবার এখানে আসন গেড়ে বোস্ দেখি। সেই তোমার টাকপড়া মাথার প্রোফেসর— নাম করতে চাই নে, দেখি, কেমন তার মুখ চুন হয়ে না যায়। আমার ছাত্র হয়ে যখন তুই বিদ্যে শুরু করলি আমি তোকে বলি নি কি, তোর নাকের সামনে ঝুলছে যাকে কথায় বলে ভবিষ্যৎ। হেলাফেলা করে সেটাকে ফোঁপরা করে দিস নে যেন। তোর জীবনীর প্রথম চ্যাপ্টারের এক কোণে আমার নামটাও ছোটো অক্ষরে লেখা যদি থাকে, সেটা হবে আমার মস্ত গুরুদক্ষিণা।"

দেখতে দেখতে বিজ্ঞানী জেগে উঠল। জ্বলে উঠল তার দুই চোখ। চেহারাটা একেবারে ভিতর থেকে গেল বদলে। মুগ্ধ হয়ে সোহিনী বললে, "তোমাকে যে-কেউ জানে তারা সকলেই তোমার এত বড়ো উন্নতির আশা করে যা প্রতিদিনের জিনিস নয়, যা চিরদিনের। কিন্তু আশা যতই বড়ো ততই বড়ো তার বাধা ভিতরে বাইরে।"

অধ্যাপক রেবতীর পিঠে আর-একবার দিলে একটা মস্ত চাপড়। ঝনঝন করে উঠল তার শিরদাঁড়া। চৌধুরী তাঁর মস্ত ভারী গলায় বললেন, "দেখ্ রেবু, যে মহৎ ভবিষ্যতের বাহন হওয়া উচিত ছিল ঐরাবত, কৃপণ বর্তমান চাপিয়ে দেয় তাকে গোরুর গাড়িতে, কাদায় পড়ে থাকে সে অচল হয়ে। শুনছ, সোহিনী, সুহি ?— না না ভয় নেই, পিঠে চাপড় মারব না। বলো সত্যি করে, কথাটা আমি কেমন গুছিয়ে বলেছি।"

"চমৎকার।"

"ওটা লিখে রেখো তোমার ডায়ারিতে।"

"তা রাখব।"

"কথাটার মানেটা বুঝেছিস তো রেবি ?"

"বোধ হয় বুঝেছি।"

"মনে রাখিস মস্ত প্রতিভার মস্ত দায়িত্ব। ও তো কারো নিজের জিনিস নয়। ওর জবাবদিহি অনন্তকালের কাছে। শুনছ সুহি, শুনছ? কথাটা কেমন বলেছি বলো তো ভাই।"

"খুব ভালো বলেছেন। আগেকার দিনের রাজা থাকলে গলা থেকে মালা খুলে—"

"তারা তো মরেছে সব, কিন্তু—"

"ঐ কিন্তুটুকু মরে নি, মনে থাকবে।"

রেবতী বললে, "ভয় নেই, কিছুতে আমাকে দুর্বল করবে না।"

সোহিনীকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেল। সোহিনী তাড়াতাড়ি আটকিয়ে দিলে।

চৌধুরী বললেন, "আরে করলে কী। পুণ্যকর্ম না করার দোষ আছে, পুণ্যকর্মে বাধা দেওয়ার দোষ আরো বেশি।"

সোহিনী বললে, "প্রণাম যদি করতে হয় তো ঐখানে।"— ব'লে বেদীর উপরে বসানো নন্দকিশোরের একটি মূর্তি দেখিয়ে দিলে। ধূপধুনা জ্বলছে, ফুলে ভরে আছে থালা।

বললে, "পাতকীকে উদ্ধার করার কথা পুরাণে পড়েছি। আমাকে উদ্ধার করেছেন ঐ মহাপুরুষ। অনেক নীচে নামতে হয়েছিল, শেষকালে তুলে বসাতে পেরেছেন— পাশে বললে মিথ্যে হবে— তাঁর পায়ের তলায়। বিদ্যার পথে মানুষকে উদ্ধার করবার দীক্ষা তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন। বলে গিয়েছেন যেন মেয়েজামাইয়ের গুমর বাড়াবার জন্যে তাঁর জীবনের খনিখোঁড়া রত্ন ছাইয়ের গাদায় হারিয়ে না ফেলি। বললেন, 'ঐখানে রেখে গেলেম আমার সদ্‌গতি, আর সদ্‌গতি আমার দেশের'।"

অধ্যাপক বললেন, "শুনলি তো রেবু। এটা হবে ট্রাস্ট-সম্পত্তি, তোকে দেওয়া হবে তার কর্তৃত্ব।"

রেবতী ব্যস্ত হয়ে বললে, "কর্তৃত্ব নেবার যোগ্য আমি নই।

আমি পারব না।”

সোহিনী বললে, “পারবে না! ছি, এ কি পুরুষের মতো কথা।”

রেবতী বললে, “আমি চিরদিন পড়াশুনো করে এসেছি, এরকম কাজের ভার কখনো নিই নি।”

চৌধুরী বললেন, “ডিম ফোটবার আগে কখনো হাঁস সাঁতার দেয় নি। আজ তোমার ডিমের খোলা ভাঙবে।”

সোহিনী বললে, “ভয় নেই তোমার, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।”

রেবতী আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল।

সোহিনী অধ্যাপকের মুখের দিকে চেয়ে রইল। চৌধুরী বললেন, “জগতে বোকা অনেকরকম আছে, পুরুষ বোকা সকল বোকার সেরা। কিন্তু মনে রেখো, দায়িত্ব হাতে না পেলে দায়িত্বের যোগ্যতা জন্মায় না। একজোড়া হাত পেয়েছে মানুষ তাই সে হয়েছে মানুষ, একজোড়া খুর পেলেই তার সঙ্গে সঙ্গে মলবার যোগ্য লেজ আপনি গজিয়ে উঠত। তুমি কি রেবতীর হাতের বদলে খুর দেখতে পেয়েছ না কি।”

“না, আমার ভালো লাগছে না। মেয়ের হাতেই যারা মানুষ কোনোকালে তাদের দুধে-দাঁত ভাঙে না। কপাল আমার। আপনি থাকতে আমি আর-কারো কথা কেন ভাবতে গেলুম।”

“খুশি হলুম শুনে। একটুখানি বুঝিয়ে দাও কী গুণ আছে আমার।”

“লোভ নেই আপনার একটুও।”

“এত বড়ো নিন্দের কথা! লোভের মতো জিনিসকে লোভ করি নে?— খুবই করি—”

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তাঁর দুই গালে দুই চুমো দিয়ে সোহিনী সরে গেল।

“কোন্ খাতায় জমা হল এটা, সোহিনী।”

"আপনার কাছে যে ঋণ পেয়েছি সে তো শোধ করতে পারি নে, তারই সুদ দিচ্ছি।"

"প্রথম দিন পেয়েছি একটি, আজ পেলুম দুটি। কেবলি বেড়ে চলবে না কি।"

"বাড়বে বৈকি, চক্রবৃদ্ধির নিয়মে।"

৮

চৌধুরী বললেন, "সোহিনী, তোমার স্বামীর শ্রাদ্ধে শেষকালে আমাকে পুরুত বানিয়ে দিলে? সর্বনাশ, এ কি কম দায়িত্ব। যার অস্তিত্ব হাতড়িয়ে পাওয়া যায় না তাকে খুশি করা! এ তো বাঁধা-দস্তুরের দান-দক্ষিনে নয় যে—"

"আপনিও তো বাঁধাদস্তুরের গুরুঠাকুর নন, আপনি যা করবেন সেটাই হবে পদ্ধতি। দানের ব্যবস্থা তৈরি করে রেখেছেন তো?"

"কদিন ধরে ঐ কাজই করেছি— দোকানবাজার কম ঘুরি নি। দানসামগ্রী সাজানো হয়ে গেছে নীচের বড়ো ঘরটাতে। ইহলোক-স্থিত আত্মা যারা এগুলো আত্মসাৎ করবে তারা পেট ভরে খুশি হবে, সন্দেহ নেই।"

চৌধুরীর সঙ্গে নীচে গিয়ে সোহিনী দেখলে, সায়ান্স-পড়ুয়া ছেলেদের জন্যে নানা যন্ত্র, নানা মডেল, নানা দামী বই, নানা মাইক্রোস্‌কোপের স্লাইড্‌স্‌, নানা বায়োলজির নমুনা। প্রত্যেক সামগ্রীর সঙ্গে নাম ও ঠিকানা -লেখা কার্ড। আড়াইশো ছেলের জন্যে চেক লেখা হয়েছে একবৎসরের বৃত্তির। খরচের জন্যে কিছুমাত্র সংকোচ করা হয় নি। বড়ো বড়ো ধনীদের শ্রাদ্ধে যে ব্রাহ্মণবিদায় হয় তার চেয়ে এর ব্যয়ের প্রসর অনেক বেশি, অথচ বিশেষ করে চোখে পড়ে না এর সমারোহ।

"পুরুতবিদায়ের কী দক্ষিণা দিতে হবে, সেটা তো আপনি ধরে

দেন নি।”

“আমার দক্ষিণা তোমার খুশি।”

“খুশির সঙ্গে সঙ্গে আপনার জন্যে রেখেছি এই ক্রনোমিটর। জর্মনি থেকে আমার স্বামী এটা কিনেছিলেন, বরাবর তাঁর রিসর্চের কাজে লেগেছিল।”

চৌধুরী বললেন, “যা মনে আসছে তার ভাষা নেই। বাজে কথা বলতে চাই নে, আমার পুরুতের কাজ সার্থক হল।”

“আর-একটি লোক আছে, আজ তাকে ভুলতে পারি নে, সে আমাদের মানিকের বিধবা বউ।”

“মানিক বলতে কাকে বোঝায়।”

“সে ছিল ওঁর ল্যাবরেটরির হেডমিস্ত্রি। আশ্চর্য তার হাত ছিল। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজে একচুল তার নড়চড় হত না, কলকব্জার তত্ত্ব বুঝে নিতে তার বুদ্ধি ছিল অভ্রান্ত। তাকে উনি অতিনিকট বন্ধুর মতো দেখতেন। গাড়ি করে নিয়ে যেতেন বড়ো বড়ো কারখানার কাজ দেখাতে। এ দিকে সে ছিল মাতাল, ওঁর অ্যাসিস্টেণ্টরা তাকে ছোটোলোক বলে অবজ্ঞা করত। উনি বলতেন, ও যে গুণী, তার সে গুণ বানিয়ে তোলা যায় না, সে গুণ খুঁজে মিলবে না। ওঁর কাছে তার সম্মান পুরোমাত্রায় ছিল। এর থেকে বুঝবেন কেন যে উনি আমাকে শেষ পর্যন্ত এত মান দিয়েছিলেন। আমার মধ্যে যে মূল্য তিনি দেখেছিলেন তার তুলনায় দোষের ওজন ওঁর কাছে ছিল খুব সামান্য। যে জায়গায় আমার মতো কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়েকে তিনি অসম্ভব রকম বিশ্বাস করেছিলেন, সে জায়গায় সে বিশ্বাস আমি কোনোদিন একটু-মাত্র নষ্ট করি নি। আজও মনপ্রাণ দিয়ে রক্ষা করছি। এতটা তিনি আর-কারো কাছে পেতেন না। যেখানে আমি ছিলেম ছোটো সেখানে আমি তাঁর চোখে পড়ি নি, যেখানে আমি ছিলুম বড়ো সেখানে তিনি আমাকে পুরো সম্মান দিয়েছেন। আমার মূল্য যদি তাঁর চোখে না পড়ত তা হলে আমি কোথায় তলিয়ে যেতুম বলুন

আমি খুব খারাপ, কিন্তু আমি নিজেই বলছি আমি খুব ভালো, নইলে তিনি আমাকে কখনো সহ্য করতে পারতেন না।"

"দেখো সোহিনী, আমি অহংকার করে বলব যে আমি প্রথম থেকেই জেনেছি তুমি খুব ভালো। সস্তা দরের ভালো হলে কলঙ্ক লাগলে দাগ উঠত না।"

"যাকগে, আমাকে আর যে লোক যা মনে করুক-না, তিনি আমাকে যা মান দিয়েছেন সে আজ পর্যন্ত টিঁকে আছে, আমার শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে।"

"দেখো সোহিনী, তোমাকে যত দেখছি ততই জানছি, তুমি সে জাতের সহজ মেয়েমানুষ নও যারা স্বামী নামটা শুনলেই গ'লে পড়ে।"

"না, তা নই, আমি দেখেছি ওঁর মধ্যে শক্তি, প্রথম দিন থেকে জেনেছি উনি মানুষ, আমি শাস্ত্র মিলিয়ে পতিব্রতাগিরি করতে বসি নি। আমি জাঁক করেই বলছি, আমার মধ্যে যে রত্ন আছে সে একা ওঁরই কণ্ঠহারে দোলবার মতো— আর কারো নয়।"

এমন সময় নীলা ঘরে এসে ঢুকে পড়ল। বললে, "অধ্যাপকমশায়, কিছু মনে করবেন না, মায়ের সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

"কিছু না মা, আমি এখন যাচ্ছি ল্যাবরেটরিতে। রেবতী কী রকম কাজ করছে দেখে আসিগে।"

নীলা বললে, "কোনো ভয় নেই। কাজ ভালোই চলছে। আমি এক-একদিন জানালার বাইরে থেকে দেখেছি, উনি মাথা গুঁজে লিখছেন, নোট নিচ্ছেন, কলম কামড়ে ধরে ভাবছেন। আমার প্রবেশনিষেধ, পাছে সার আইজাকের গ্রাভিটেশন যায় ন'ড়ে। সেদিন মা কাকে বলছিলেন উনি ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌ নিয়ে কাজ করছেন— তাই পাশ দিয়ে কেউ গেলেই কাঁটা নড়ে যায়, বিশেষত মেয়েরা।"

চৌধুরী হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, "মা, ল্যাবরেটরি ভিতরেই আছে, ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌ নিয়ে কাজ চলছেই, কাঁটা যাঁরা নড়িয়ে দেন তাঁদের ভয় করতেই হয়। দিগ্‌ভ্রম ঘটায় যে। তবে চললুম।"

নীলা মাকে বললে, "আমাকে আর কতদিন তোমার আঁচলের গাঁঠ দিয়ে বেঁধে রাখবে। পেরে উঠবে না, কেবল দুঃখ পাবে।"

"তুই কী করতে চাস বল্।"

নীলা বললে, "তুমি তো জানোই মেয়েদের জন্যে একটা Higher Study Movement খোলা হয়েছে, তুমি তাতে অনেক টাকা দিয়েছ। সেখানে আমাকে কেন কাজে লাগাও না।"

"আমার ভয় আছে পাছে তুই ঠিকমত না চলিস।"

"সব চলাই বন্ধ করে দেওয়াই কি ঠিক চলার রাস্তা।"

"তা নয়, তা তো জানি, সেই তো আমার ভাবনা।"

"তুমি না ভেবে একবার আমাকে ভাবতে দাও-না। সে তো দিতেই হবে। আমি তো এখন খুকি নই। তুমি ভাবছ সেই-সব পাবলিক জায়গায় নানা লোকের যাওয়া আসা আছে, সে একটা বিপদ। জগৎ সংসারে লোক-চলাচল তো বন্ধ হবে না তোমার খাতিরে। আর তাদের সঙ্গে আমার জানাশুনো একেবারেই ঠেকিয়ে রাখবে যে সে আইন তো তোমার হাতে নেই।"

"জানি সব জানি, ভয় ক'রে ভয়ের কারণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। তা হলে তুই ওদের হাইয়র স্টাডি সার্কলে ভরতি হতে চাস?"

"হ্যাঁ চাই।"

"আচ্ছা তাই হবে। সেখানকার পুরুষ অধ্যাপকদের একে একে দিবি জাহান্নমে সে জানি। কেবল একটি কথা দিতে হবে আমাকে। কোনোমতেই তুই রেবতীর কাছে ঘেঁষতে পাবি নে। আর কোনো ছুতোতেই ঢুকবি নে তার ল্যাবরেটরিতে।"

"মা, তুমি আমাকে কী মনে করো ভেবে পাই নে। কাছে ঘেঁষতে যাব তোমার ঐ খুদে সার আইজাক নিউটনের, এমন রুচি আমার?— মরে গেলেও না।"

সংকোচ বোধ করলে রেবতী শরীরটাকে নিয়ে যে রকম আঁকুবাঁকু করে তারই নকল ক'রে নীলা বললে, "ঐ স্টাইলের পুরুষকে নিয়ে

আমার চলবে না। যে-সব মেয়েরা ভালোবাসে বুড়ো খোকাদের মানুষ করতে, ওকে জিইয়ে রেখে দেওয়া ভালো তাদেরই জন্যে। ও মারবার যোগ্য শিকারই নয়।”

“একটু বেশি বাড়িয়ে কথা বলছিস নীলা, তাই ভয় হচ্ছে ওটা ঠিক তোর মনের কথা নয়। তা হোক, ওর সম্বন্ধে তোর মনের ভাব যাই হোক, ওকে যদি মাটি করতে চাস তা হলে সে তোর পক্ষে ভালো হবে না।”

“কখন তোমার কী মর্জি কিছুই বুঝতে পারি নে মা। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্যে তুমি আমাকে সাজিয়ে পুতুল গড়ে তুলেছিলে, সে কি আমি বুঝতে পারি নি। সেইজন্যেই কি তুমি আমাকে ওর বেশি কাছে আনাগোনা করতে বারণ করছ, পাছে চেনাশোনার ঘেঁষ লেগে পালিশ নষ্ট হয়ে যায়।”

“দেখ্, নীলা, আমি তোকে বলে দিচ্ছি তোর সঙ্গে ওর বিয়ে কিছুতেই হতে পারবে না।”

“তা হলে আমি যদি মোতিগড়ের রাজকুমারকে বিয়ে করি ?”

“ইচ্ছা হয় তো করিস।”

“সুবিধে আছে, তার তিনটে বিয়ে, আমার দায় অনেকটা হালকা হবে, আর সে মদ খেয়ে ঢলাঢলি করে নাইটক্লাবে—তখন আমি অনেকটা ছুটি পাব।”

“আচ্ছা বেশ, সেই ভালো। রেবতীর সঙ্গে তোর বিয়ে হতে দেব না।”

“কেন, তোমার সার আইজাক নিউটনের বুদ্ধি আমি ঘুলিয়ে দেব মনে করো ?”

“সে তর্ক থাক্, যা বললুম তা মনে রাখিস।”

“উনি নিজেই যদি হ্যাংলাপনা করেন ?”

“তা হলে এ পাড়া তাকে ছাড়তে হবে—তোর অন্নে তাকে মানুষ করিস, তোর বাপের তহবিল থেকে এক কড়িও সে পাবে না।”

"সর্বনাশ! তা হলে নমস্কার সার আইজাক নিউটন।"

সেদিনকার পালা সংক্ষেপে এই পর্যন্ত।

৯

"চৌধুরীমশায়, আর সবই চলছে ভালো কেবল আমার মেয়ের ভাবনায় সুস্থির হতে পারছি নে। ও যে কোন্ দিকে তাক করতে শুরু করেছে বুঝতে পারছি নে।"

চৌধুরী বললেন, "আবার ওর দিকে তাক করছে কারা সেটাও একটা ভাববার কথা। হয়েছে কি, এরই মধ্যে রটে গেছে ল্যাবরেটরি রক্ষার জন্যে তোমার স্বামী অগাধ টাকা রেখে গেছে। মুখে মুখে তার অঙ্কটা বেড়েই চলেছে। এখন রাজত্ব আর রাজকন্যা নিয়ে বাজারে একটা জুয়োখেলার সৃষ্টি হয়েছে।"

"রাজকন্যাটি মাটির দরে বিকোবে তা জানি, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে রাজত্ব সস্তায় বিকোবে না।"

"কিন্তু লোকের আমদানি শুরু হয়েছে। সেদিন হঠাৎ দেখি, আমাদেরই অধ্যাপক মজুমদার ওরই হাত ধরে বেরিয়ে এল সিনেমা থেকে। আমাকে দেখেই ঘাড় বেঁকিয়ে নিল। ছেলেটা ভালো ভালো বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়, দেশের মঙ্গলের দিকে ওর বুলি খুব সহজে খেলে। কিন্তু সেদিন ওর বাঁকা ঘাড় দেখে স্বদেশের জন্যে ভাবনা হল।"

"চৌধুরীমশায়, আগল ভেঙেছে।"

"ভেঙেছে বৈকি। এখন এই গরিবকেই নিজের ঘটি-বাটি সামলাতে হবে।"

"মজুমদার-পাড়ায় মড়ক লাগে লাগুক, আমার ভয় রেবতীকে নিয়ে।"

চৌধুরী বললেন, "আপাতত ভয় নেই। খুব ডুবে আছে। কাজ

করছে খুব চমৎকার।”

“চৌধুরীমশায়, ওর বিপদ হচ্ছে সায়ান্সে ও যত বড়ো ওস্তাদই হোক, তুমি যাকে মেট্রিয়ার্কি বলো সে রাজ্যের ও ঘোর আনাড়ি।”

“সে কথা ঠিক। ওর একবারও টিকে দেওয়া হয় নি। ছোঁয়াচ লাগলে বাঁচানো শক্ত হবে।”

“রোজ একবার কিন্তু ওকে আপনার দেখে যেতে হবে।”

“কোথা থেকে ও আবার ছোঁয়াচ না নিয়ে আসে। শেষকালে এ বয়সে আমি না মরি। ভয় কোরো না, মেয়েমানুষ যদিও, তবুও আশা করি ঠাট্টা বুঝতে পারো। আমি পার হয়ে গেছি এপিডেমিকের পাড়াটা। এখন ছোঁওয়া লাগলেও ছোঁয়াচ লাগে না। কিন্তু একটা মুশকিল ঘটেছে। পরশু আমাকে যেতে হবে গুজরানওয়ালায়।”

“এটাও ঠাট্টা নাকি। মেয়েমানুষকে দয়া করবেন।”

“ঠাট্টা নয়, আমার সতীর্থ অমূল্য আড্ডি ছিলেন, সেখানকার ডাক্তার। বিশপঁচিশ বছর প্র্যাকটিস করেছেন। কিছু বিষয়সম্পত্তিও জমিয়েছেন। হঠাৎ বিধবা স্ত্রী আর ছেলে-মেয়ে রেখে মরেছেন হার্টফেল করে। দেনা-পাওনা চুকিয়ে জমিজমা বেচে তাদের উদ্ধার করে আনতে হবে আমাকে। কতদিন লাগবে ঠিক জানি নে।”

“এর উপরে আর কথা নেই।”

“এ সংসারে কথা কিছুরই উপরে নেই সোহিনী। নির্ভয়ে বলো, যা হবেই তা হোক। যারা অদৃষ্ট মানে তারা ভুল করে না। আমরা সায়ান্টিস্টরাও বলি অনিবার্যের একচুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। যতক্ষণ কিছু করবার থাকে করো, যখন কোনোমতেই পারবে না, বোলো বাস্।”

“আচ্ছা তাই ভালো।”

“যে মজুমদারটির কথা বললুম, দলের মধ্যে সে তত বেশি মারাত্মক নয়। তাকে ওরা দলে টেনে রাখে মান বাঁচাবার জন্যে। আর-যাদের কথা শুনেছি, চাণক্যের মতে তাদের কাছ থেকে শত

হস্ত দূরে থাকলেও ভাবনার কারণ থেকে যায়। অ্যাটর্নি আছে বঙ্কুবিহারী, তাকে আশ্রয় করা আর অক্টোপস্‌কে জড়িয়ে ধরা একই কথা। ধনী বিধবার তপ্ত রক্ত এই-সব লোক পছন্দ করে। খবরটা শুনে রাখো, যদি কিছু করবার থাকে কোরো। সবশেষে আমার ফিলজফিটা মনে রেখো।"

"দেখুন চৌধুরীমশায়, রেখে দিন ফিলজফি। মানব না আপনার অদৃষ্ট, মানব না আপনার কার্যকারণের অমোঘ বিধান, যদি আমার ল্যাবরেটরির 'পরে কারো হাত পড়ে। আমি পাঞ্জাবের মেয়ে, আমার হাতে ছুরি খেলে সহজে। আমি খুন করতে পারি তা সে আমার নিজের মেয়ে হোক, আমার জামাইপদের উমেদার হোক।"

ওর শাড়ির নীচে ছিল কোমরবন্ধ লুকোনো। তার থেকে ধাঁ করে এক ছুরি বের করে আলোয় ঝলক খেলিয়ে দিয়ে গেল। বললে, "তিনি আমাকে বেছে নিয়েছিলেন—আমি বাঙালির মেয়ে নই, ভালোবাসা নিয়ে কেবল চোখের জল ফেলে কান্নাকাটি করি নে। ভালোবাসার জন্যে প্রাণ দিতে পারি, প্রাণ নিতে পারি। আমার ল্যাবরেটরি আর আমার বুকের কলিজা, তার মাঝখানে রয়েছে এই ছুরি।"

চৌধুরী বললেন, "একসময়ে কবিতা লিখতে পারতুম, আজ আবার মনে হচ্ছে হয়তো পারি লিখতে।"

"কবিতা লিখতে হয় লিখবেন, কিন্তু আপনার ফিলজফি ফিরিয়ে নিন। যা না মানবার তাকে আমি শেষ পর্যন্ত মানব না। একলা দাঁড়িয়ে লড়ব। আর বুক ফুলিয়ে বলব, জিতবই, জিতবই, জিতবই।"

"ব্র্যাভো, আমি ফিরিয়ে নিলুম আমার ফিলজফিটা। এখন থেকে লাগাব ঢাকে চাঁটি তোমার জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে। আপাতত কিছুদিনের জন্যে বিদায় নিচ্ছি, ফিরতে দেরি হবে না।"

আশ্চর্যের কথা এই সোহিনীর চোখে জল ভরে এল। বললে,

"কিছু মনে করবেন না।" জড়িয়ে ধরলে চৌধুরীর গলা। বললে, "সংসারে কোনো বন্ধনই টেঁকে না, এও মুহূর্তকালের জন্যে।"

বলেই গলা ছেড়ে দিয়ে পায়ের কাছে প'ড়ে সোহিনী অধ্যাপককে প্রণাম করলে।

১০

খবরের কাগজে যাকে বলে পরিস্থিতি সেটা হঠাৎ এসে পড়ে, আর আসে দল বেঁধে। জীবনের কাহিনী সুখে দুঃখে বিলম্বিত হয়ে চলে। শেষ অধ্যায়ে কোলিশন লাগে অকস্মাৎ, ভেঙেচুরে স্তব্ধ হয়ে যায়। বিধাতা তাঁর গল্প গড়েন ধীরে ধীরে, গল্প ভাঙেন এক ঘায়ে।

সোহিনীর আইমা থাকেন আম্বালায়। সোহিনী তাঁর কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছে, 'যদি দেখা করতে চাও শীঘ্র এসো।'

এই আইমা তার একমাত্র আত্মীয় যে বেঁচে আছে। এরই হাত থেকে নন্দকিশোর কিনে নিয়েছিলেন সোহিনীকে।

নীলাকে তার মা বললে, "তুমিও আমার সঙ্গে এসো।"

নীলা বললে, "সে তো কিছুতেই হতে পারে না।"

"কেন পারে না।"

"ওরা আমাকে অভিনন্দন দেবে তারই আয়োজন চলছে।"

"ওরা কারা।"

"জাগানী ক্লাবের মেম্বররা। ভয় পেয়ো না, খুব ভদ্র ক্লাব। মেম্বরদের নামের ফর্দ দেখলেই বুঝতে পারবে। খুবই বাছাই করা।"

"তোমাদের উদ্দেশ্য কী।"

"স্পষ্ট বলা শক্ত। উদ্দেশ্যটা নামের মধ্যেই আছে। এই নামের তলায় আধ্যাত্মিক সাহিত্যিক আর্টিস্টিক সব মানেই খুব গভীরভাবে লুকোনো আছে। নবকুমারবাবু খুব চমৎকার ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন। ওরা ঠিক করেছে, তোমার কাছ থেকে চাঁদা নিতে আসবে।"

"কিন্তু চাঁদা দেখছি ওরা নিয়ে শেষ করেছে। তুমি ষোলো আনাই পড়েছ ওর হাতে। কিন্তু এই পর্যন্তই। আমার যেটা ত্যাজ্য সেটাই ওরা পেয়েছে। আমার কাছ থেকে আর কিছু পাবার নেই।"

"মা, এত রাগ করছ কেন। ওঁরা নিঃস্বার্থভাবে দেশের উপকার করতে চান।"

"আচ্ছা সে আলোচনা থাক্। এতক্ষণে তুমি বোধ হয় তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে খবর পেয়েছ যে তুমি স্বাধীন।"

"হাঁ পেয়েছি।"

"নিঃস্বার্থরা তোমাকে জানিয়েছেন যে তোমার স্বামীর দত্ত অংশে তোমার যে টাকা আছে সে তুমি যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারো?"

"হাঁ জেনেছি।"

"আমার কানে এসেছে উইলের প্রোবেট নেবার জন্যে তোমরা প্রস্তুত হচ্ছ। কথাটা বোধ হয় সত্যি?"

"হাঁ সত্যি। বঙ্কুবাবু আমার সোলিসিটর।"

"তিনি তোমাকে আরো কিছু আশা এবং মন্ত্রণা দিয়েছেন।"

নীলা চুপ করে রইল।

"তোমার বঙ্কুবাবুকে আমি সিধে করে দেব যদি আমার সীমানায় তিনি পা বাড়ান। আইনে না পারি বেআইনে। ফেরবার সময় আমি পেশোয়ার হয়ে আসব। আমার ল্যাবরেটরি রইল দিনরাত্রি চারজন শিখ সিপাইয়ের পাহারায়। আর যাবার সময় এই তোমাকে দেখিয়ে যাচ্ছি— আমি পঞ্জাবের মেয়ে।"

বলে নিজের কোমরবন্ধ থেকে ছুরি বের করে বললে, "এ ছুরি না চেনে আমার মেয়েকে না চেনে আমার মেয়ের সোলিসিটরকে। এর স্মৃতি রইল তোমার জিম্মায়। ফিরে এসে যদি হিসেব নেবার সময় হয় তো হিসেব নেব।"

১১

ল্যাবরেটরির চার দিকে অনেকখানি জমি ফাঁকা আছে। কাঁপন বা শব্দ যাতে যথাসম্ভব কাজের মাঝখানে না পৌঁছয়। এই নিস্তব্ধতা কাজের অভিনিবেশে রেবতীকে সহায়তা করে। তাই ও প্রায়ই এখানে রাত্রে কাজ করতে আসে।

নীচের ঘড়িতে দুটো বাজল। মুহূর্তের জন্য রেবতী তার চিন্তার বিষয় ভাবছিল জানালার বাইরে আকাশের দিকে চোখ মেলে।

এমন সময়ে দেওয়ালে পড়ল ছায়া। চেয়ে দেখে ঘরের মধ্যে এসেছে নীলা। রাত-কাপড় পরা, পাতলা সিল্কের শেমিজ। ও চমকে চৌকি থেকে উঠে পড়তে যাচ্ছিল। নীলা এসে ওর কোলের উপর বসে গলা জড়িয়ে ধরল। রেবতীর সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল, বুক উঠতে পড়তে লাগল প্রবলবেগে। গদ্‌গদ কণ্ঠে বলতে লাগল, "তুমি যাও, এ ঘর থেকে তুমি যাও।"

ও বললে, "কেন।"

রেবতী বললে, "আমি সহ্য করতে পারছি নে। কেন এলে তুমি এ ঘরে।"

নীলা ওকে আরো দৃঢ় বলে চেপে ধরে বললে, "কেন, আমাকে কি তুমি ভালোবাসো না।"

রেবতী বললে, "বাসি, বাসি, বাসি। কিন্তু এ ঘর থেকে তুমি যাও।"

হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল পাঞ্জাবী প্রহরী। ভর্ৎসনার কণ্ঠে বললে, "মায়িজি, বহুত শরমকি বাৎ হ্যায়, আপ বাহার চলা যাইয়ে।"

রেবতী চেতন-মনের অগোচরে ইলেকট্রিক ডাকঘড়িতে কখন চাপ দিয়েছিল।

পাঞ্জাবী রেবতীকে বললে, "বাবুজি, বেইমানি মৎ করো।"

রেবতী নীলাকে জোর করে ঠেলে দিয়ে চৌকি থেকে উঠে

পড়ল। দারোয়ান ফের নীলাকে বললে, "আপ বাহার চলা যাইয়ে, নহি তো মনিবকো হুকুম তামিল করেগা।"

অর্থাৎ জোর করে অপমান করে বের করে দেবে। বাইরে যেতে যেতে নীলা বললে, "শুনছেন সার আইজাক নিউটন?— কাল আমাদের বাড়িতে আপনার চায়ের নেমন্তন্ন, ঠিক চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময়। শুনতে পাচ্ছেন না? অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন?" বলে একবার তার দিকে ফিরে দাঁড়ালে।

বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে উত্তর এল, "শুনেছি।"

রাত-কাপড়ের ভিতর থেকে নীলার নিখুঁত দেহের গঠন ভাস্করের মূর্তির মতো অপরূপ হয়ে ফুটে উঠল, রেবতী মুগ্ধ চোখে না দেখে থাকতে পারল না। নীলা চলে গেল। রেবতী টেবিলের উপর মুখ রেখে পড়ে রইল। এমন আশ্চর্য সৌন্দর্য সে কল্পনা করতে পারে না। একটা কোন্ বৈদ্যুত বর্ষণ প্রবেশ করেছে ওর শিরার মধ্যে, চকিত হয়ে বেড়াচ্ছে অগ্নিধারায়। হাতের মুঠো শক্ত করে রেবতী কেবলই নিজেকে বলাতে লাগল, কাল চায়ের নিমন্ত্রণে যাবে না। খুব শক্ত শপথ করবার চেষ্টা করতে চায়, মুখ দিয়ে বেরয় না। ব্লটিঙের উপর লিখল, যাব না, যাব না, যাব না। হঠাৎ দেখলে তার টেবিলে একটা ঘন লাল রঙের রুমাল পড়ে আছে, কোণে নাম সেলাই করা 'নীলা'। মুখের উপর চেপে ধরল রুমাল, গন্ধে মগজ উঠল ভরে, একটা নেশা সিরসির করে ছড়িয়ে গেল সর্বাঙ্গে।

নীলা আবার ঘরের মধ্যে এল। বললে, "একটা কাজ আছে ভুলে গিয়েছিলুম।"

দরোয়ান রুখতে গেল। নীলা বললে, "ভয় নেই তোমার, চুরি করতে আসি নি। একটা কেবল সই চাই। জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট করব তোমাকে— তোমার নাম আছে দেশ জুড়ে।"

অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে রেবতী বললে, "ও ক্লাবের আমি তো কিছুই জানি নে।"

"কিছুই তো জানবার দরকার নেই। এইটুকু জানলেই হবে ব্রজেন্দ্রবাবু এই ক্লাবের পেট্রন।"

"আমি তো ব্রজেন্দ্রবাবুকে জানি নে।"

"এইটুকু জানলেই হবে, মেট্রপলিটান ব্যাঙ্কের তিনি ডাইরেক্টর। লক্ষ্মী আমার, জাদু আমার, একটা সই বৈ তো নয়।" ব'লে ডান হাত দিয়ে তার কাঁধ ঘিরে তার হাতটা ধরে বললে, "সই করো।"

সে স্বপ্নাবিষ্টের মতো সই করে দিলে।

কাগজটা নিয়ে নীলা যখন মুড়ছে দরোয়ান বললে, "এ কাগজ আমাকে দেখতে হবে।"

নীলা বললে, "এ তো তুমি বুঝতে পারবে না।"

দরোয়ান বললে, "দরকার নেই বোঝবার।" বলে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে। বললে, "দলিল বানাতে হয় বাইরে গিয়ে বানিয়ো। এখানে নয়।"

রেবতী মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। দরোয়ান নীলাকে বললে, "মাজি, এখন চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসিগে।" বলে তাকে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আবার ঘরে ঢুকল পাঞ্জাবী। বললে, "চার দিকে আমি দরজা বন্ধ করে রাখি, তুমি ওকে ভিতর থেকে খুলে দিয়েছ।"

এ কী সন্দেহ, কী অপমান। বারবার করে বললে, "আমি খুলি নি।"

"তবে ও কী করে ঘরে এল।"

সেও তো বটে। বিজ্ঞানী তখন সন্ধান করে বেড়াতে লাগল ঘরে ঘরে। অবশেষে দেখলে রাস্তার ধারের একটা বড়ো জানলা ভিতর থেকে আগল দেওয়া ছিল, কে সেই আগলটা দিনের বেলায় এক সময়ে খুলে রেখে গেছে।

রেবতীর যে ধূর্ত বুদ্ধি আছে এতটা শ্রদ্ধা তার প্রতি দরোয়ানজির ছিল না। বোকা মানুষ, পড়াশুনো করে এই পর্যন্ত তার তাকত।

অবশেষে কপাল চাপড়ে বললে, "আওরত ! এ শয়তানি বিধিদত্ত।"

যে অল্প একটু রাত বাকি ছিল রেবতী নিজেকে বারবার করে বলালে, চায়ের নিমন্ত্রণে যাবে না।

কাক ডেকে উঠল। রেবতী চলে গেল বাড়িতে।

১২

পরের দিন সময়ের একটু ব্যতিক্রম হল না। চায়ের সভায় চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটেই রেবতী গিয়ে হাজির। ভেবেছিল এ সভা নিভৃতে দুজনকে নিয়ে। ফ্যাশনেবল সাজ ওর দখলে নেই। পরে এসেছে জামা আর ধুতি, ধোবার বাড়ি থেকে নতুন কাচিয়ে আনা, আর কাঁধে ঝুলছে একটা পাটকরা চাদর। এসে দেখে সভা বসেছে বাগানে। অজানা শৌখিন লোকের ভিড়। দমে গেল ওর সমস্ত মনটা, কোথাও লুকোতে পারলে বাঁচে। একটা কোণ নিয়ে বসবার চেষ্টা করতেই সবাই উঠে পড়ল। বললে, "আসুন আসুন ডক্টর ভট্টাচার্য, আপনার আসন এইখানে।"

একটা পিঠ-উঁচু মখমলে-মোড়া চৌকি, মণ্ডলীর ঠিক মাঝখানেই। বুঝতে পারলে সমস্ত জনতার প্রধান লক্ষ্যই ও। নীলা এসে ওর গলায় মালা পরিয়ে দিলে, কপালে দিলে চন্দনের ফোঁটা। ব্রজেন্দ্রবাবু প্রস্তাব করলেন ওকে জাগানী সভার সভাপতি পদে বরণ করা হোক। সমর্থন করলেন বঙ্কুবাবু, চারি দিকে করতালির ধ্বনি উঠল। সাহিত্যিক হরিদাসবাবু ডক্টর ভট্টাচার্যের ইণ্টার-ন্যাশনাল খ্যাতির কথা ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, "রেবতীবাবুর নামের পালে হাওয়া লাগিয়ে আমাদের জাগানী ক্লাবের তরণী খেয়া দেবে পশ্চিম-মহাসমুদ্রের ঘাটে ঘাটে।"

সভার ব্যবস্থাপকেরা রিপোর্টারদের কানে কানে গিয়ে বললে, "উপমাগুলোর কোনোটা যেন রিপোর্ট থেকে বাদ না যায়।"

বক্তারা একে একে উঠে যখন বলতে লাগল 'এতদিন পরে ডক্টর ভট্টাচার্য সায়েন্সের জয়তিলক ভারতমাতার কপালে পরিয়ে দিলেন' রেবতীর বুকটা ফুলে উঠল—নিজেকে প্রকাশমান দেখলে সভ্য-জগতের মধ্যগগনে। জাগানী সভা সম্বন্ধে যে-সমস্ত দাগী রকমের জনশ্রুতি শুনেছিল মনে মনে তার প্রতিবাদ করলে। হরিদাসবাবু যখন বললে, 'রেবতীবাবুর নামের কবচ রক্ষাকবচরূপে এ সভরা গলায় আজ ঝোলানো হল, এর থেকে বোঝা যাবে এ সভার উদ্দেশ্য কত মহোচ্চ', তখন রেবতী নিজের নামের গৌরব ও দায়িত্ব খুব প্রবলরূপে অনুভব করলে। ওর মন থেকে সংকোচের খোলসটা খসে পড়ে গেল। মেয়েরা মুখের থেকে সিগারেট নামিয়ে ঝুঁকে পড়ল ওর চৌকির উপর, মধুর হাস্যে বললে, "বিরক্ত করছি আপনাকে, কিন্তু একটা অটোগ্রাফ দিতেই হবে।"

রেবতীর মনে হল, এতদিন সে যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিল, স্বপ্নের গুটি গেছে খুলে, প্রজাপতি বেরিয়ে পড়েছে।

একে একে লোক বিদায় হল। নীলা রেবতীর হাত চেপে ধরে বললে, "আপনি কিন্তু যাবেন না।"

জ্বালাময় মদ ঢেলে দিলে ওর শিরার মধ্যে।

দিনের আলো শেষ হয়ে আসছে, লতাবিতানের মধ্যে সবুজ প্রদোষের অন্ধকার।

বেঞ্চির উপরে দুজনে কাছাকাছি বসল। নিজের হাতের উপরে রেবতীর হাত তুলে নিয়ে নীলা বললে, "ডক্টর ভট্টাচার্য, আপনি পুরুষমানুষ হয়ে মেয়েদের অত ভয় করেন কেন।"

রেবতী স্পর্ধাভরে বললে, "ভয় করি? কখনো না।"

"আমার মাকে আপনি ভয় করেন না?"

"ভয় কেন করব, শ্রদ্ধা করি।"

"আমাকে?"

"নিশ্চয় ভয় করি।"

"সেটা ভালো খবর। মা বলেছেন, কিছুতে আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন না। তা হলে আমি আত্মহত্যা করব।"

"কোনো বাধা আমি মানব না, আমাদের বিয়ে হবেই হবে।"

কাঁধের উপর মাথা রেখে নীলা বললে, "তুমি হয়তো জানো না, তোমাকে কতখানি চাই।"

নীলার মাথাটা আরো বুকের কাছে টেনে নিয়ে রেবতী বললে, "তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই।"

"জাত ?"

"ভাসিয়ে দেব জাত।"

"তা হলে রেজিস্ট্রারের কাছে কালই নোটিস দিতে হবে।"

"কালই দেব, নিশ্চয় দেব।"

রেবতী পুরুষের তেজ দেখাতে শুরু করেছে।

পরিণামটা দ্রুতবেগে ঘনিয়ে আসতে লাগল।

আইমার পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। মৃত্যুর আশঙ্কা আসন্ন। যে পর্যন্ত মৃত্যু না হয় সোহিনীকে তিনি কিছুতে ছাড়বেন না। এই সুযোগটাকে দুহাত দিয়ে আঁকড়িয়ে ধ'রে নীলার উন্মত্ত যৌবন আলোড়িত হয়ে উঠেছে।

পাণ্ডিত্যের চাপে রেবতীর পৌরুষের স্বাদ ফিকে হয়ে গেছে— তাকে নীলার যথেষ্ট পছন্দ নয়। কিন্তু ওকে বিবাহ করা নিরাপদ, বিবাহোত্তর উচ্ছৃঙ্খলতায় বাধা দেবার জোর তার নেই। শুধু তাই নয়। ল্যাবরেটরির সঙ্গে যে লোভের বিষয় জড়ানো আছে তার পরিমাণ প্রভূত। ওর হিতৈষীরা বলে ল্যাবরেটরির ভার নেবার যোগ্যতর পাত্র কোথাও মিলবে না রেবতীর চেয়ে, সোহিনী কিছুতে ওকে হাতছাড়া করবে না, এই হচ্ছে বুদ্ধিমানদের অনুমান।

এ দিকে সহযোগীদের ধিক্কার শিরোধার্য ক'রে রেবতী জাগানী ক্লাবের অধ্যক্ষতার সংবাদ ঘোষণা করতে দিলে সংবাদপত্রে। নীলা

যখন বলত 'ভয় লাগছে বুঝি', ও বলত 'আমি কেয়ার করি নে'। ওর পৌরুষ সম্বন্ধে সংশয়মাত্র না থাকে এই জেদ ওকে পেয়ে বসল। বললে 'এডিংটনের সঙ্গে চিঠিপত্র আমার চলে. একদিন এই ক্লাবে আমি তাঁকে নিমন্ত্রিত করে আনব', ক্লাবের মেম্বররা বললে 'ধন্য'।

রেবতীর আসল কাজ গেছে বন্ধ হয়ে। ছিন্ন হয়ে গেছে ওর সমস্ত চিন্তাসূত্র। মন কেবলই অপেক্ষা করছে নীলা কখন আসবে, হঠাৎ পিছন থেকে ধরবে ওর চোখ টিপে। চৌকির হাতার উপর বসে বাঁ হাতে ধরবে ওর গলা জড়িয়ে। নিজেকে এই বলে আশ্বাস দিচ্ছে, ওর কাজটা যে বাধা পেয়েছে সেটা ক্ষণিক, একটু সুস্থির হলেই ভাঙার মুখে আবার জোড়া লাগবে। সুস্থির হবার লক্ষণ আশু দেখা যাচ্ছে না। ওর কাজের ক্ষতিতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হচ্ছে নীলার মনের এক কোণেও সে শঙ্কা নেই, সমস্তটাকে সে প্রহসন মনে করে।

দিনের পর দিন জাল কেবলই জড়িয়ে যাচ্ছে। জাগানী সভা ওকে ছেঁকে ধরেছে, ওকে ঘোরতর পুরুষমানুষ বানিয়ে তুলছে। এখনো অকথ্য মুখ থেকে বেরয় না, কিন্তু অশ্রাব্য শুনলে জোর করে হাসতে থাকে। ডক্টর ভট্টাচার্য ওদের খুব একটা মজার জিনিস হয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে রেবতীকে ঈর্ষায় কামড়িয়ে ধরে। ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টরের মুখের চুরট থেকে নীলা চুরট ধরায়। এর নকল করা রেবতীর অসাধ্য। চুরটের ধোঁয়া গলায় গেলে ওর মাথা ঘুরে পড়ে, কিন্তু এই দৃশ্যটা ওর শরীরমনকে আরো অসুস্থ করে তোলে। তা ছাড়া নানা-রকমের ঠেলাঠেলি টানাটানি যখন চলতে থাকে, ও আপত্তি না জানিয়ে থাকতে পারে না। নীলা বলে, 'এই দেহটার 'পরে আমাদের তো কোনো মোহ নেই, আমাদের কাছে এর দাম কিসের— আসল দামী জিনিস ভালোবাসা, সেটা কি বিলিয়ে ছড়িয়ে দিতে পারি।' ব'লে চেপে ধরে রেবতীর হাত। রেবতী তখন অন্যদের অভাজন বলেই মনে করে, ভাবে ওরা ছোবড়া নিয়েই খুশি, শাঁসটা পেল না।

ল্যাবরেটরির দ্বারের বাইরে দিনরাত পাহারা চলছে, ভিতরে ভাঙা কাজ পড়ে রয়েছে, কারো দেখা নেই।

১৩

ড্রয়িংরুমে সোফায় পা দুটো তুলে কুশনে হেলান দিয়ে নীলা, মেঝের উপরে নীলার পায়ের কাছে ঠেস দিয়ে বসে আছে রেবতী, হাতে রয়েছে লেখন ভরা ফুলস্ক্যাপ।

রেবতী মাথা নেড়ে বললে, "ভাষায় কেমন যেন বেশি রঙ ফলানো হয়েছে, এতটা বাড়িয়ে-বলা লেখা পড়তে লজ্জা করবে আমার।"

"ভাষার তুমি মস্ত সমজদার কিনা। এ তো কেমিস্ট্রি ফরমূলা নয়, খুঁত খুঁত কোরো না, মুখস্থ করে যাও। জানো এটা লিখেছেন আমাদের সাহিত্যিক প্রমদারঞ্জনবাবু?"

"ঐ-সব মস্ত মস্ত সেণ্টেন্স আর বড়ো বড়ো শব্দগুলো মুখস্থ করা আমার পক্ষে ভারি শক্ত হবে।"

"ভারি তো শক্ত। তোমার কানের কাছে আউড়ে আউড়ে আমার তো সমস্তটা মুখস্থ হয়ে গেছে— 'আমার জীবনের সর্বোত্তম শুভ মুহূর্তে জাগানী সভা আমাকে যে অমরাবতীর মন্দারমাল্যে সমলংকৃত করিলেন',— grand! তোমার ভয় নেই আমি তো তোমার কাছেই থাকব, আস্তে আস্তে তোমাকে বলে দেব।"

"আমি বাংলাসাহিত্য ভালো জানি নে কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছে, সমস্ত লেখাটা যেন আমাকে ঠাট্টা করছে। ইংরেজিতে যদি বলতে দাও কত সহজ হয়। Dear friends, allow me to offer you my heartiest thanks for the honour you have conferred upon me on behalf of the Jagani Club— the great Awakener ইত্যাদি— এমন দুটো sentence বললেই বাস্—"

"সে হচ্ছে না, তোমার মুখে বাংলা যে খুব মজার শোনাবে— ঐ যেখানটাতে আছে, 'হে বাংলাদেশের তরুণসম্প্রদায়, হে স্বাতন্ত্র্যসঞ্চালনরথের সারথি, হে ছিন্নশৃঙ্খলপরিকীর্ণ পথের অগ্রণীবৃন্দ' —যাই বলো ইংরেজিতে এ কি হবার জো আছে। তোমার মতো বিজ্ঞানবিশারদের মুখে শুনলে তরুণ বাংলা সাপের মতো ফণা তুলিয়ে নাচবে। এখনো সময় আছে আমি পড়িয়ে নিচ্ছি।"

গুরুভার দীর্ঘ দেহকে সিঁড়ির উপর দিয়ে সশব্দে বহন করে সাহেবী পোশাকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ব্রজেন্দ্র হালদার মচমচ শব্দে এসে উপস্থিত। বললে, "নাঃ এ অসহ্য, যখনই আসি নীলাকে দখল করে বসে আছ। কাজ নেই কর্ম নেই, নীলিকে তফাত করে রেখেছ আমাদের কাছ থেকে কাঁটাগাছের বেড়ার মতো।"

রেবতী সংকুচিত হয়ে বললে, "আজ আমার একটু বিশেষ কাজ আছে তাই—"

"কাজ তো আছে, সেই ভরসাতেই তো এসেছিলুম, আজ তুমি মেম্বরদের নেমন্তন্ন করেছ, ব্যস্ত থাকবে মনে করে আপিসে যাবার আগে আধ ঘণ্টাটাক সময় করে নিয়ে তাড়াতাড়ি এসেছি। এসেই শুনছি এখানেই উনি পড়েছেন কাজে বাঁধা। আশ্চর্য। কাজ না থাকলে এখানেই ওঁর ছুটি, আবার কাজ থাকলে এইখানেই ওঁর কাজ। এমন নাছোড়বান্দার সঙ্গে আমরা কেজো লোকেরা পাল্লা দিই কী করে। নীলি, is it fair !"

নীলা বললে, "ডক্টর ভট্টচাজের দোষ হচ্ছে, উনি আসল কথাটা জোর করে বলতে পারেন না। উনি কাজ আছে বলে এসেছেন এটা বাজে কথা; না এসে থাকতে পারেন না বলেই এসেছেন, এটাই একটা শোনবার মতো কথা এবং সত্যি কথা। আমার সমস্ত সময় উনি দখল করেছেন ওঁর জেদের জোরে। এই তো ওঁর পৌরুষ। তোমাদের সবাইকে ঐ বাঙালের কাছে হার মানতে হল।"

"আচ্ছা ভালো, তা হলে আমাদেরও পৌরুষ চালাতে হবে।

এখন থেকে জাগানী-ক্লাব-মেম্বররা নারীহরণের চর্চা শুরু করবে। জেগে উঠবে পৌরাণিক যুগ।"

নীলা বললে, "বেশ মজা লাগছে শুনতে। নারীহরণ, পাণি-গ্রহণের চেয়ে ভালো। কিন্তু পদ্ধতিটা কী রকম।"

হালদার বললে, "দেখিয়ে দিতে পারি।"

"এখনই ?"

"হাঁ, এখনই।"

বলেই সোফা থেকে নীলাকে আড়কোলা করে তুলে নিলে।

নীলা চীৎকার করে হেসে ওর গলা জড়িয়ে ধরলে।

রেবতীর মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল, ওর মুশকিল এই যে অনুকরণ করবার কিংবা বাধা দেবার মতো গায়ের জোর নেই। ওর বেশি করে রাগ হতে লাগল নীলার 'পরে, এই-সব অসভ্য গোঁয়ারদের প্রশ্রয় দেয় কেন।

হালদার বললে, "গাড়ি তৈরি আছে। তোমাকে নিয়ে চললুম ডায়মণ্ডহারবারে। আজ সন্ধের ভোজে ফিরিয়ে এনে দেব। ব্যাঙ্কে কাজ ছিল, সেটা যাকগে চুলোয়। একটা সৎকার্য করা হবে। ডাক্তার ভট্‌চাজকে নির্জনে কাজ করবার সুবিধে করে দিচ্ছি। তোমার মতো অতবড়ো ব্যাঘাতকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভালো, এজন্যে উনি আমাকে ধন্যবাদ দেবেন।"

রেবতী দেখলে, নীলার ছটফট করবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, নিজেকে সে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টামাত্র করলে না, বেশ যেন আরামে ওর বক্ষ আশ্রয় করে রইল। ওর গলা জড়িয়ে রইল বিশেষ একটা আসক্তভাবে। যেতে যেতে বললে, "ভয় নেই বিজ্ঞানী সাহেব, এটা নারীহরণের রিহর্সল মাত্র— লঙ্কাপারে যাচ্ছি নে, ফিরে আসব তোমার নেমন্তন্নে।"

রেবতী ছিঁড়ে ফেললে সেই লেখাটা। হালদারের বাহুর জোর এবং অসংকুচিত অধিকার বিস্তারের তুলনায় নিজের বিদ্যাভিমান ওর

কাছে আজ বৃথা হয়ে গেল।

আজ সান্ধ্যভোজ একটা নামজাদা রেস্টোরাঁতে। নিমন্ত্রণকর্তা স্বয়ং রেবতী ভট্টাচার্য, তাঁর সম্মানিতা পার্শ্ববর্তিনী নীলা। সিনেমার বিখ্যাত নটী এসেছে গান গাইতে। টোস্ট প্রোপোজ করতে উঠেছে বঙ্কুবিহারী, গুণগান হচ্ছে রেবতীর আর তার নামের সঙ্গে জড়িয়ে নীলার। মেয়েরা খুব জোরের সঙ্গে সিগারেট টানছে প্রমাণ করতে যে তারা সম্পূর্ণ মেয়ে নয়। প্রৌঢ়া মেয়েরা যৌবনের মুখোশ পরে ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে অট্টহাস্যে উচ্চকণ্ঠে পরস্পর গা টেপাটিপিতে যুবতীদের ছাড়িয়ে যাবার জন্যে মাতামাতির ঘোড়দৌড় চালিয়েছে।

হঠাৎ ঘরে ঢুকল সোহিনী। স্তব্ধ হয়ে গেল ঘরসুদ্ধ সবাই। রেবতীর দিকে তাকিয়ে সোহিনী বললে, "চিনতে পারছি নে। ডক্টর ভট্টাচার্য বুঝি? খরচের টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলে, পাঠিয়ে দিয়েছি গেল শুক্রবারে; এই তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কিছু অকুলোন হচ্ছে না। এখন একবার উঠতে হচ্ছে, আজ রাত্রেই ল্যাবরেটরির ফর্দ অনুসারে জিনিসপত্র মিলিয়ে দেখব।"

"আপনি আমাকে অবিশ্বাস করছেন?"

"এতদিন অবিশ্বাস তো করি নি। কিন্তু লজ্জাশরম যদি থাকে বিশ্বাসরক্ষার কথা তুমি আর মুখে এনো না।"

রেবতী উঠতে যাচ্ছিল, নীলা তাকে কাপড় ধরে টেনে বসিয়ে দিলে। বললে, "আজ উনি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছেন, সকলে যান আগে, তার পরে উনি যাবেন।"

এর মধ্যে একটা নিষ্ঠুর ঠোকর ছিল। সার আইজাক মায়ের বড়ো পেয়ারের, ওর মতো এতবড়ো বিশ্বাসী আর কেউ নেই, তাই সকলকে ছাড়িয়ে ল্যাবরেটরির ভার ওর উপরেই। আরো একটু দেগে দেবার জন্যে বললে, "জানো মা?— অতিথি আজ পঁয়ষট্টি জন, এ ঘরে সকলকে ধরে নি, একদল আছে পাশের ঘরে— ঐ শুনছ না

হো হো লাগিয়েছে? মাথা-পিছু পঁচিশ টাকা ধরে নেয়, মদ না খেলেও মদের দাম ধরে দিতে হয়। খালি গেলাসের জরিমানা কম লাগল না। আর কেউ হলে মুখ চুপসে যেত। ওঁর দরাজ হাত দেখে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরের তাক লেগে গেছে। সিনেমার গাইয়েকে কত দিতে হয়েছে জানো?— তার এক রাত্তিরের পাওনা চারশো টাকা।"

রেবতীর মনের ভিতরটা কাটা কইমাছের মতো ধড়ফড় করছে। শুকনো মুখে কথাটি নেই।

সোহিনী জিজ্ঞাসা করলে, "আজকের সমারোহটা কিসের জন্যে।"

"তা জানো না বুঝি? অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে তো বেরিয়ে গেছে, উনি জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, তারই সম্মানে এই ভোজ। লাইফ মেম্বরশিপের ছশো টাকা সুবিধেমত পরে শুধে দেবেন।"

"সুবিধে বোধ হয় শীঘ্র হবে না।"

রেবতীর মনটার মধ্যে স্টীম-রোলার চলাচল করছিল।

সোহিনী তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তা হলে এখন তোমার ওঠবার সুবিধে হবে না।"

রেবতী নীলার মুখের দিকে তাকালে। তার কুটিল কটাক্ষের খোঁচায় পুরুষমানুষের অভিমান জেগে উঠল। বললে, "কেমন করে যাই, নিমন্ত্রিতেরা সব—"

সোহিনী বললে, "আচ্ছা, আমি ততক্ষণ এখানে বসে রইলুম। নাসেরউল্লা, তুমি দরজার কাছে হাজির থাকো।"

নীলা বললে, "সে হতে পারবে না, মা। আমাদের একটা গোপন পরামর্শ আছে, এখানে তোমার থাকা উচিত হবে না।"

"দেখ্‌ নীলা, চাতুরীর পালা তুই সবে শুরু করেছিস, এখনো আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবি নে। তোদের কিসের পরামর্শ সে খবর কি আমি পাই নি। বলে দিচ্ছি, তোদের সেই পরামর্শের জন্যে আমারই থাকা সব চেয়ে দরকার।"

নীলা বললে, "তুমি কী শুনেছ, কার কাছে।"

"খবর নেবার ফন্দি থাকে গর্তর সাপের মতো টাকার থলির মধ্যে। এখানে তিনজন আইনওয়ালা মিলে দলিলপত্রা ঘেঁটে বের করতে চাও ল্যাবরেটরি ফণ্ডে কোনো ছিদ্র আছে কিনা। তাই নয় কি, নীলু।"

নীলা বললে, "তা সত্যি কথা বলব। বাবার অতখানি টাকায় তাঁর মেয়ের কোনো শেয়ার থাকবে না, এটা অস্বাভাবিক। তাই সবাই সন্দেহ করে—"

সোহিনী চৌকি থেকে উঠে দাঁড়াল। বললে, "আসল সন্দেহের মূল আরো অনেক আগেকার দিনের। কে তোর বাপ, কার সম্পত্তির শেয়ার চাস। এমন লোকের তুই মেয়ে এ কথা মুখে আনতে তোর লজ্জা করে না?"

নীলা লাফিয়ে উঠে বললে, "কী বলছ, মা।"

"সত্যি কথা বলছি। তাঁর কাছে কিছুই গোপন ছিল না, তিনি জানতেন সব। আমার কাছে যা পাবার তা তিনি সম্পূর্ণ পেয়েছেন, আজও পাবেন তা, আর-কিছু তিনি গ্রাহ্য করেন নি।"

ব্যারিস্টর ঘোষ বললে, "আপনার মুখের কথা তো প্রমাণ নয়।"

"সে কথা তিনি জানতেন। সকল কথা খোলসা করে তিনি দলিল রেজিস্ট্রি করে গেছেন।"

"ওহে বন্ধু, রাত হল যে, আর কেন। চলো।"

পেশোয়ারীর ভঙ্গি দেখে পঁয়ষট্টি জন অন্তর্ধান করলে।

এমন সময় সুটকেস হাতে এসে উপস্থিত চৌধুরী। বললেন, "তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে আসতে হল। কী রে রেবি, বেবি, মুখখানা যে পার্চমেণ্টের মতো সাদা হয়ে গেছে। ওরে, খোকার দুধের বাটি গেল কোথায়।"

নীলাকে দেখিয়ে সোহিনী বললে, "যিনি জোগাবেন তিনি যে ঐ বসে আছেন।"

"গয়লানীর ব্যাবসা ধরেছ নাকি, মা।"

"গয়লা ধরার ব্যাবসা ধরেছে, ঐ যে বসে আছে শিকারটি।"

"কে, আমাদের রেবি নাকি।"

"এইবার আমার মেয়ে আমার ল্যাবরেটরিকে বাঁচিয়েছে। আমি লোক চিনতে পারি নি; কিন্তু আমার মেয়ে ঠিক বুঝেছিল যে ল্যাবরেটরিতে গোয়ালঘর বসিয়ে দিয়েছিলুম— গোবরের কুণ্ডে আর-একটু হলেই ডুবত সমস্ত জিনিসটা।"

অধ্যাপক বললেন, "মা, তুমি এই জীবটিকে আবিষ্কার করেছ যখন, তখন এই গোষ্ঠবিহারীর ভার তোমাকেই নিতে হবে। ওর আর সবই আছে কেবল বুদ্ধি নেই, তুমি কাছে থাকলে তার অভাবটা টের পাওয়া যাবে না। বোকা পুরুষদের নাকে দড়ি দিয়ে চালিয়ে নিয়ে বেড়ানো সহজ।"

নীলা বললে, "কী গো সার আইজাক নিউটন, রেজেস্ট্রি আপিসে নোটিস তো দেওয়া হয়েছে, ফিরিয়ে নিতে চাও না কি।"

বুক ফুলিয়ে রেবতী বললে, "মরে গেলেও না।"

"বিয়েটা হবে তা হলে অশুভ লগ্নে।"

"হবেই, নিশ্চয় হবে।"

সোহিনী বললে, "কিন্তু ল্যাবরেটরি থেকে শত হস্ত দূরে।"

অধ্যাপক বললেন, "মা নীলু, ও বোকা, কিন্তু অক্ষম নয়। ওর নেশাটা কেটে যাক, তার পরে ওর খোরাকের জন্যে বেশি ভাবতে হবে না।"

"সার আইজাক, তা হলে কিন্তু তোমার কাপড়চোপড়গুলো একটু ভদ্র রকমের বানাতে হবে, নইলে তোমার সামনে আমাকে আবার ঘোমটা ধরতে হবে।"

হঠাৎ আর-একটা ছায়া পড়ল দেয়ালে। পিসিমা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "রেবি, চলে আয়।"

সুড় সুড় করে রেবতী পিসিমার পিছন পিছন চলে গেল, একবার ফিরেও তাকাল না।

—